বরুচি

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি

গ্রন্থপীঠ
২০৯, কর্ণোয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ ১৩ই আষাঢ় স্নানযাত্রা ১৩৬৮
প্রকাশক কোরক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থপীঠ ২০৯ কর্নোয়ালিস স্ট্রীট কলি ৬
মুদ্রক সুনীল রুদ্র রুদ্র অ্যাণ্ড কোং লিঃ ৩২ মদন মিত্র লেন কলি ৬
প্রচ্ছদ ব্লক ও মুদ্রণ সৌরীন্দ্র দাশগুপ্ত রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট ৭।১ কর্নোয়ালিস স্ট্রীট কলি ৬
প্রচ্ছদশিল্পী বিভূতি সেনগুপ্ত

দু'টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি

॥ আরম্ভের আগে ॥

'নবকেতন' মাসিক-পত্রিকাটি আকারে ছোট হলেও তার মধ্যে যেসব নতুন নতুন ফীচার লাগিয়েছিলাম, সেগুলি বহু পাঠকের প্রশংসা পেয়েছিল ঃ ফলে পত্রিকাটি জনপ্রিয়ও হয়েছিল এবং তার সম্পাদকরূপে আমিও কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলাম।

আগামী মাস থেকে নবকেতনের নতুন বছর স্থরু হবে। গ্রাহকদের চিঠি লেখা, নতুন লেখা বাছাবাছি করা, লেখকদের সৌজন্য-পত্র দেওয়া—এমনি ধরনের নানা কাজে ব্যস্ত আছি, এমন সময় একদিন সকালে পত্রিকা-কার্যালয়ে এক ভদ্রলোক এলেন।

ভিতরের ঘরে একলাই ছিলাম।

বেয়ারা এসে একটি শ্লিপ্ সামনে ধরলো। দেখলাম লেখা রয়েছে ঃ সুশান্ত মিত্র, পুলিশ ইনস্পেকটার (রিটায়ার্ড)।

অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-কর্মচারী আমার কাছে কী কাজে? কৌতূহল হল। ভিতরে ডাকলাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকে ভদ্রলোক নমস্কার করলেন। বোধ হল যেন কিছু বিব্রত বোধ করছেন।

বললাম, বস্থন।

সামনের চেয়ারে বসে আগন্তুক মিনিট খানেক চুপ করে থেকে একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে বড্ড অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম। দেখছি আপনি খুব ব্যস্ত ····

এমন আর কি! বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি।

আমতা আমতা করে ভদ্রলোক বললেন, একটি বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছি। আমি কালই কলকাতা ছেড়ে মাস তিনেকের জন্যে বাইরে যাব, তাই আজ আপনার কাছে এলাম ....

মনে মনে বললাম, মাথা কিনেছেন!

মুখে বললাম, তা বেশ তো। বলুন, আপনার কি দরকার!

ভদ্রলোক বিনয়ে আনত হলেন: বেশীক্ষণ আপনার সময় নষ্ট করব না সার, তার আগে নিজের পরিচয়টা দিয়ে নি। কাগজের টুকরোয় যে পরিচয় দিয়েছি, সেটি আমার এখনকার সত্যি পরিচয় নয়। সম্প্রতি আমি সাহিত্যচর্চা সুরু করেছি, তাই এখন যদি নিজেকে সাহিত্যিক বলে পরিচয় দি, তাহলে কি অন্যায় করব?

না, তা কেন করবেন। তারপর বলুন।

মনে মনে কিছু অসহিষ্ণু বোধ করছিলাম। ভদ্রলোক যেন অযথা বাকবিস্তার করতে চাইছেন।

আবার মিনিট খানেক চুপচাপ।

তারপর সুশান্ত মিত্র আসল কথাটা পাড়লেন, বললেন, আমি একটি উপন্যাস লিখেছি। সেটি আপনার কাছে এনেছি, আপনি যদি দয়া করে আপনার বিখ্যাত পত্রিকায় সেটি ছাপেন তাহলে আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। যদিও আমি নতুন লেখক, আমার নাম নেই, তাহলেও আমার বিশ্বাস, গল্পটি পড়লে আপনি খুসী হবেন।

এবার সত্যিই বিপদে পড়লাম। ঠিক এ আশঙ্কা মনে

জাগেনি। নতুন লেখকের নতুন গল্প! যে কোন মাসিক পত্রিকার সম্পাদক জানেন, এমনি ধারা কত গল্পই না প্রত্যহ তাঁর দপ্তরে আসে, এমনি ধারা কত না লেখক! তাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতির আভাস যে মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না তা নয়, কিন্তু সে তো হাজারে একটা! এখন একে নিয়ে কী করি!

বললাম, তা নিশ্চয় হব। কিন্তু, হাতে এখন অনেকগুলি লেখা রয়েছে যা শেষ হতে হয়ত এক বছর লাগবে, তাই ভাবছি ....

ভদ্রলোক ঘাড়টা একটু এগিয়ে দিলেন, কণ্ঠস্বরে ঈষৎ আবেগ মিশিয়ে বললেন, দেখুন সার, আমার নামডাক নেই, কিন্তু তাহলেও আমার বিশ্বাস আমি খারাপ লিখিনি। আপনি দয়া করে পড়েই দেখুন না!

এই বলে হাতের ফোলিও ব্যাগ খুলে একখানি মোটা খাতা আমার সামনে রাখলেন।

বললাম, গোটা খাতাটাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু খুব বড় নয়। ফাঁক ফাঁক লেখা।

সেরেছে! এত বড় একখানা জাবদা খাতা পড়ে শেষ করা যে কী মেহনতের কাজ তা আমার মতো ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবেন না।

সুশান্ত মিত্র এবার একটু জোর দিয়েই বললেন, আপনি দয়া করে পড়ে দেখুন, যদি ভাল না লাগে, ফেলে দেবেন।

খাতাখানা উল্টে দেখলাম, হাতের লেখাটা মন্দ নয়, গোটা গোটা হরফ, পরিচ্ছন্ন।

বললাম, কি বিষয় নিয়ে গল্পটি?

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, বিষয়! কী জানেন, বিষয়

তেমন কিছু নতুন নয়। একটি নারীঘটিত ব্যাপার আর তার ফলে যে ট্র্যাজেডি ঘটেছিল তারই কাহিনী।

হরি হরি! একেবারেই মামুলী!

সুশান্ত মিত্র আমার মুখের ভাব দেখে বোধ হয় মনের কথাটা পড়ে ফেললেন। পুলিশের দারোগা তো! কত লোকের জিব টেনে পেটের কথা বার করেছেন! তাড়াতাড়ি বললেন, কিন্তু গল্পটির একটি বড় রকম বিশেষত্ব আছে। এর মধ্যে যে সব ঘটনা আছে তার একটিও কাল্পনিক নয়, প্রত্যেকটি আমার চোখের সামনে ঘটেছে। এ গল্পের আমি শুধু দর্শকই নই, অভিনেতাও।

এ যে দেখছি আবার নাটক সুরু হল। দর্শক, অভিনেতা!

বললাম, কী জানেন, গল্প-উপন্যাসের মূল্য ঘটনার সত্যিমিথ্যের ওপর নির্ভর করে না। সে কথা থাক। ভাবছি, নতুন বড় লেখা দেবার জায়গা হবে কি! জানেনই তো, আমার কাগজের আয়তন খুবই ছোট!

তা জানি। তাহলেও সার এটি আপনাকে নিতেই হবে। দয়া করে পড়ে দেখবেন, তারপর ....

ভদ্রলোকের নির্বন্ধাতিশয্যে করুণা হল।

বললাম, আচ্ছা রেখে যান, সময়মত পড়ে দেখবো। কিন্তু কবে যে দেখে উঠতে পারবো তার কোন ঠিক সময় দিতে পারছি না। আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে।

কতদিন অপেক্ষা করব?

ধরুন, মাস তিনেক। তিনমাস পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

তি-ন মা-স। আচ্ছা তাই আসবো।

সুশান্ত মিত্র চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন।

খাতাখানির প্রথম দু'তিন পৃষ্ঠা উল্টে দেখছিলাম, বললাম, এক মিনিট। দেখছি, উপন্যাসটির নাম দিয়েছেন, 'স্মৃতির প্রদীপ জ্বালি', তারপর লেখা আরম্ভ হয়েছে, উত্তম পুরুষ অর্থাৎ 'আমি' দিয়ে এবং দেখছি একজন দারোগা যেন তাঁর আত্মকাহিনী বলছেন। দারোগা তাহলে বোধ করি আপনিই ?

ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু অন্য নামে। গল্পটি পড়লেই সব বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এখন তাহলে আসি। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। তিনমাস পরে আবার দেখা হবে।

সুশান্ত মিত্র চলে গেলেন। আমিও খাতাখানি ড্রয়ারের মধ্যে রেখে অসমাপ্ত কাজে আবার মন দিলাম।

বেশ কিছুদিন পরে কী একটা ফাইলের খোঁজে সেই দেরাজটি খুলতে গিয়ে সুশান্ত মিত্রের পাণ্ডুলিপিটি নজরে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে লেখক-কে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কী মিনতি করেই না ভদ্রলোক লেখাটি আমায় পড়ে দেখতে বলেছিলেন।

সেদিন হাতে কোন কাজ ছিল না। লেখাটি বার করে সঙ্গে নিলাম। বাড়ি গিয়ে সময়মতো পড়ে ফেলব্বো।

রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পর খাতাখানি খুলে বসলাম। মামুলী ধরনের সূচনা। কিন্তু হঠাৎ গল্পটির মোড় ঘুরে গেল। তারপর কখন যে শেষ করলাম সে খেয়াল ছিল না।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙলো তখন সর্বাগ্রে সেই গল্পটির কথা স্মরণ হল। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি

জেগে উঠল। মনে হল, আমি যেন একটি মানুষের এক ভয়ঙ্কর গোপন কথা আবিষ্কার করেছি ....

সুশান্ত মিত্রের গল্প আমার পত্রিকায় ছাপা হয়নি। কেন হয়নি, তা আমি আমার পাঠক-পাঠিকাকে জানাবো, এখন নয়, পরে : গল্পের শেষে পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে আমার আর-একবার দেখা হবে : ইতিমধ্যে তাঁরা উপন্যাসটি পড়ুন।

॥ এক ॥

আমি যখন বিছানা ছেড়ে উঠে পুবদিকের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন বেলা বোধ করি ন'টা বেজে গিয়েছে। বিস্তীর্ণ আলস্য আর বিশ্রামের মধ্যে এমনি করে ঘুমিয়ে গড়িয়ে আর বই প'ড়ে দিন কাটছিল।

চব্বিশ পরগনার এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের দারোগা আমি।

দোর্দণ্ড প্রতাপ, তা বলাই বাহুল্য। স্বাধীন জীবনযাত্রা। কোনদিন থানায় যাই, কোনদিন যাই না। বাড়ি বসেই খাতায় নোট লিখে পাঠিয়ে দি।

বছর চারেক এখানে আছি। কিন্তু এ তল্লাটের বিশেষ কারুকেই চিনি না। দু'তিনজন যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাঁদের পরিচয় পাঠক যথাস্থানে পাবেন।

মুখহাত ধুঁয়ে চায়ের পেয়ালা আর এ সপ্তাহের পত্রিকাখানা নিয়ে বসেছি এমন সময় বাইরে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম ঃ কে যেন আমার ভৃত্য সদাশিবকে জিজ্ঞাসা করছে, বাবু কখন উঠবেন ? আমি কি দাঁড়াবো ?

সদাশিব উত্তর দিলে, দাঁড়াবে কি না তা আমি কেমন করে বলব ! এই মাত্র বোধ হয় উঠেছেন।

বুঝলাম, কেউ আমার খোঁজ করছে। হেঁকে বললাম, সদা, কে আমায় খুঁজছে ? তাকে এখানে পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই একজন কৃশকায় লোক ভিতরে ঢুকে দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলে।

বললাম, কী চাও? কোত্থেকে আসছ?

আজ্ঞে, আমি কুমার বাহাদুরের কাছ থেকে আসছি। তিনি আপনাকে ডেকেছেন।

বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, তিনি কি এখানে এসেছেন?

ঘাড় নেড়ে লোকটি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল রাত্রে এসেছেন। এই যে তাঁর চিঠি।

দরজার বাইরে থেকে সদাশিব বিড় বিড় করে বলে উঠল, আবার এসেছেন বুঝি! দু'বছর ছিলেন না, বেঁচেছিলাম। এইবার আবার সুরু হবে। আর তার সঙ্গে আমাদের বাবুও ....

তাড়া দিয়ে উঠলাম, চুপ কর সদাশিব।

ধমক খেয়ে সে ধীরে ধীরে সরে গেল।

এই সদাশিবকে নিয়ে আর পারি না, যখন তখন যার তার সামনে এমন সব কথা বলে' বসে যাতে আমাকে অত্যন্ত অপ্রস্তুত হতে হয়। কী করি! বাপ-পিতোমোর আমলের লোক, কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে, তাই তার সব উপদ্রবই সহ্য করতে হয়।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে বললাম, তিনি এখন কি করছেন? তুমি কে? তোমায় তো আগে দেখিনি?

আজ্ঞে, তিনি এখন বাগানে বসে চা খাচ্ছেন। আমি এই এক বছর হল রাজাবাবুর কাজে লেগেছি, আমি তাঁর খাসবেয়ারা, আমার নাম কার্তিক। মাঝে আমি হুজুরের চিঠি নিয়ে এখানকার গোমস্তাবাবুর কাছে এসে কিছুদিন থেকে গিছলাম। তারপর কাল হুজুরের সঙ্গেই আবার এসেছি।

চিঠিখানা খুললাম: সেই পরিচিত কুদৃশ্য হাতের লেখা আর বাঁকাচোরা লাইন—

"ভাই বিন্নু,

নিশ্চয়ই বহালতবিয়তে আছো এবং আশা করি ইতিমধ্যে তোমার বন্ধুটিকে ভুলে যাও নি। পত্রপাঠ চলে আসবে। কাল রাত্রে এসেছি এবং প্রিয়দর্শনে বঞ্চিত হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় আছি। আমি নিজেই যেতাম, কিন্তু কাল রাত্রে মাত্রাধিক্যের ফলে হাত পা এখনো সচল হয়ে ওঠে নি। শিগগির এসো। পথ চেয়ে রইলাম। ইতি, তোমার

গোপিকারমণ।"

কুমার গোপিকারমণ রায় আসাম অঞ্চলের এক বড় জমিদারের ছেলে। ঠাকুর্দার খেতাব ছিল—রাজা। সেই থেকে তাঁর বংশধরগণ নিজেদের নামের আগে 'কুমার' খেতাবটি জুড়ে দিয়েছে। খেতাবটিই শুধু আছে। শাঁস নেই বললেই হয়।

চিঠি পড়া শেষ করে মুখ তুলতেই কুমার বাহাদুরের খাস-ভৃত্য সবিনয়ে বললে, হুজুর, তাঁকে গিয়ে কি বলব?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে মুহূর্তের জন্যে মন দ্বিধাগ্রস্ত হল। আবার সেই বাগানবাড়ি, আবার সেই বেলাইন-জীবন! গতবার কিছুদিন তার সঙ্গে জীবনযাপনের পর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, সে কথাও স্মরণ হল।

কিন্তু আমার এই বৈচিত্রহীন জীবনযাত্রায় প্রলোভন দমন করা সহজ নয়। মনে পড়ল, কুমারের সেই প্রমোদ-কানন। তার চারিদিক ঘিরে রমণীয় প্রাকৃতিক শোভা, দিকে দিকে

ছায়াশীতল কুঞ্জবন, কক্ষে কক্ষে বিলাস-উপকরণের প্রাচুর্য ···· আমার অসাড় দেহমন যেন উদগ্রীব হয়ে উঠল।

বললাম, তাঁকে গিয়ে বলো, আমি সন্ধ্যে নাগাদ আসছি।

বিকাল উত্তীর্ণ হবার আগেই সাজসজ্জা করে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে মাইলখানেক দূরে কুমার গোপিকারমণের বাগান। গ্রামের প্রান্তে একটি বড় ঝিল এঁকেবেঁকে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। তারই পাশ দিয়ে মন্থরপদে পথ অতিক্রম করছিলাম।

খুব গরম পড়েছে। তার ওপর গুমোট। চারিদিক যেন থমথম করছে। আকাশে মেঘের আনাগোনা। ঝিলের জলে তার ছায়া পড়েছে। শান্ত নিস্তরঙ্গ জলাশয়ের ওপর বনের পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে। অদূরে একটা জেলের নৌকা দেখা যাচ্ছে। কিছু দূরে পায়ে-চলার যে পথটি গ্রামের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে তার ওপর দিয়ে হাট থেকে মেয়ে-পুরুষের দল ঘরে ফিরছে।

পথ চলতে চলতে কুমার গোপিকারমণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা ভাবছিলাম। লোকে জানে, কুমার একজন প্রকাণ্ড ধনীব্যক্তি, এ অঞ্চলে তার অনেক জমিজমা, আর আমি একজন সামান্য মাইনের দারোগা—সুতরাং আমি তার বন্ধুত্ব পাবার জন্যে লালায়িত, আমি তার মোসাহেব। লোকে আরও মনে করে, আমাদের দু'জনের মধ্যে এত যে ভাব, তার কারণ আমরা দু'জনেই একই প্রকৃতির লোক—অর্থাৎ দু'জনেই সমান দুশ্চরিত্র।

কিন্তু লোকে জানে না, আমাদের আচার ভিন্ন, প্রকৃতি ভিন্ন। লোকে জানে না, অন্তরে অন্তরে আমি কুমারের প্রতি

মোটেই শ্রদ্ধান্বিত নই, বরং তার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা আর অশ্রদ্ধার অন্ত নেই। তার মুখের ওপরেই আমি যখন তখন তাকে কটূক্তি করি।

কিন্তু সে তবুও আমাকে ছাড়তে চায় না, আমার সকল ঔদ্ধত্যকে সে হাসিমুখে সহ্য করে, আমার প্রতি তার সত্যিকারের একটি আন্তরিক টান আছে।

মানুষের মনের গতি সত্যিই বড় বিচিত্র। মনের মধ্যে বিরাগ। কিন্তু তবুও চলেছি তারই দিকে যার প্রতি সেই বিরূপতা। সেদিন যদি তার কাছে না গিয়ে ফিরে আসতাম, তাহলেই স্বাভাবিক হত, শোভন হত।

পরে কতদিন কতবার ভেবেছি, সেদিন যদি গোপিকা রমণের বাগানে আমোদ করতে না যেতাম তাহলে জীবনের অনেকখানি দুর্ভাগ্যের হাত থেকে নিজে তো রক্ষা পেতামই, অন্য অনেকগুলি মানুষও হয়ত নিষ্কৃতি পেত। অতীতের যে স্মৃতির দাহে আজ আমার অন্তর-বাহির পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে, সেদিনের সেই একটি সন্ধ্যার প্রমোদ-অভিসারকে নিবৃত্ত করতে পারলেই তার কোন উত্তাপই আজ আমায় ভোগ করতে হত না।

আমাকে পেয়ে বন্ধুর সে কী কলোচ্ছ্বাস!

গলা জড়িয়ে ধরে, চুমো খেয়ে, একেবারে যাকে বলে যা-তা কাণ্ড।

ভেবেছিলাম, বুঝি এলে না। কতদিন পরে আবার দেখা হল বল তো। কী আনন্দ হচ্ছে, তা বলবার নয়।

হেসে বললাম, উচ্ছ্বাস থামাও। ঘরে আরও দু'জন ভদ্রলোক

রয়েছেন, তাঁরা কি ভাবছেন বল তো! কোথায় এঁদের সঙ্গে আগে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে, তা নয় ....

নিশ্চয়, নিশ্চয়, পরিচয় হবে বৈকি।

কিন্তু তোমার কাণ্ড দেখে ওঁরা হাসছেন।

বাগানের পিছন দিকে যে তৃণাচ্ছাদিত ঘেরা জমি, তারই ওপর গার্ডেন চেয়ার সাজানো হয়েছে, এবং সেইখানেই কুমার গোপিকারমণ তার মজলিশ বসিয়েছে।

কুমারের পাশেই বসেছিলেন একটি অপরিচিত ভদ্রলোক। বেঁটে খাটো চেহারা। মুখের ওপর ক্রূরতার রেখা। প্রথম দর্শনেই লোকটির প্রতি মনে বিতৃষ্ণা জাগলো।

দ্বিতীয় ব্যক্তি, কুমারের এখানকার জমিদারির নবনিযুক্ত গোমস্তা। নাম শুনলাম, সীতানাথ। শান্ত নম্র চেহারা। বয়স চল্লিশ হবে।

সীতানাথকে ভাল লাগল। তার সঙ্গে মৃদুকণ্ঠে আলাপ করতে লাগলাম।

দেখলাম, অপরিচিত ভদ্রলোক কুমারকে কী যেন বলে উঠে চলে গেলেন।

আমার দিকে ফিরে গোপিকারমণ বললে—সীতানাথের সঙ্গে আলাপ করছ? তুমি তো এর আগে সীতানাথকে দেখনি, না?

বললাম, না, এই প্রথম দেখছি।

প্রায় একবছর হল ওকে এখানে পাঠিয়েছি।

তাই নাকি? এক বছর ....

হ্যাঁ, তা হবে বৈকি। তুমি তো ভুলেও এদিক মাড়াবে না যে দেখতে পাবে, কে গেল আর কে এলো

একটু থেমে কুমার সীতানাথকে উদ্দেশ করে বললে, দেখ সীতানাথ, আমার বন্ধুর জন্যে আজ রাত্রে কিছু খানাপিনার আয়োজন কর। বুঝেছো? হ্যাঁ, আর দেখ, সঙ্গে সঙ্গে, বুঝেছো তো, ওটাও যেন থাকে।

কুমারের শেষ কথায় কোন একটি প্রসিদ্ধ উপন্যাসের সংলাপ মনে পড়ল। তার লম্পট নায়ক ঠিক এমনি সুরেই তার গোমস্তার কাছে এমনি ধরনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিল।

মনিবের কথা শুনে সীতানাথের ঘাড় ঝুঁকে পড়েছিল। অস্ফুটে কি বললে বোঝা গেল না।

কুমারের খাসবেয়ারা কার্তিক অদূরে দাঁড়িয়েছিল। মনিবের শেষ কথাটা লুফে নিয়ে বলে উঠল, যে আজ্ঞে, সেবিষয়ে আপনাকে কোন চিন্তে করতে হবে না হুজুর। সময়মত সব ঠিক পাবেন। আমরা আপনার অধীনে আছি তবে কোন্ কাজে?

অপূর্ব যোগাযোগ। মণিকাঞ্চন সংযোগও বলা যেতে পারে। উপযুক্ত মনিবের এমন উপযুক্ত ভৃত্য সহজে চোখে পড়ে না।

সীতানাথের বিব্রতভাব দেখে তার প্রতি মনে শ্রদ্ধা জাগল।

চুরোট ধরিয়ে গোপিকারমণ সীতানাথের দিকে চেয়ে কাজের কথা সুরু করলে: দেখ সীতানাথ, খাজনা আদায়ের দিকে একটু বেশী করে নজর রাখবে। ভয়ানক পাজী সব প্রজা। না ঠেঙালে ট্যাঁক থেকে পয়সা বার করে না। বুঝেছো? আর ঐ যে, কে-লোকটা আজ প্রায় এক বছর এসে মহেশতলার পাকাবাড়ীটা ভাড়া নিয়েছে, সে তো শুনছি ছ' মাসের ওপর ভাড়া বাকি ফেলেছে। তাকে আর রাখা চলবে না। তাগাদা দিয়েছিলে? কী বলে লোকটা?

সবিস্ময়ে সীতানাথ বললে, তাগাদা দিয়েছিলাম। কি জানেন, ভদ্রলোকের মাথাটা একটু বিগড়ে গেছে। খুব দুঃসময় ওঁদের। তবে ওঁর মেয়ে বলেছে, শিগগিরই ভাড়া শোধ করে দেবে।

ওধার থেকে কার্তিক বলে উঠল, এই নীলমাধববাবুর কথা বলছেন? হ্যাঁঃ, উনি আর ভাড়া দিয়েছেন। আর ওঁর মেয়ে! বাব্বা, কি জাঁহাবাজ মেয়ে! তার কাছে এগোয় কার সাধ্যি।

কুমার বললে, বটে! তাই নাকি? কত বড় মেয়ে? দেখতে কেমন?

কার্তিক সোল্লাসে কি বলতে যাচ্ছিল, সহসা সীতানাথ তাকে ধমক দিয়ে উঠল। দেখলাম, কার্তিকের ওপর সে রীতিমতো রেগে উঠেছে।

পরক্ষণেই নিজের আচরণে সীতানাথ বোধ হয় লজ্জা পেল, আমাদের দিকে ফিরে নম্রকণ্ঠে বললে, হুজুর, ওঁরা ভাল লোক. ভদ্রলোক। নীলমাধববাবু বড় দরের মাস্টার ছিলেন। ওঁর মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওঁদের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছে। তবে ওঁরা টাকা মারবার লোক নন। নিশ্চয় দিয়ে দেবেন।

অপ্রীতিকর আলোচনা বন্ধ করবার জন্যে বললাম, চল গোপিকারমণ, একটু বেড়িয়ে আসা যাক, অনেকদিন এদিক পানে আসিনি। তুমিও এসো সীতানাথ।

সূর্য অস্তে গেছে।

পশ্চিম আকাশে বিচিত্র বর্ণের সমারোহ তখনো মিলিয়ে যায় নি।

দূর থেকে বাঁশীর সুর ভেসে আসছে। বোধ হয় কোন রাখাল বালক গরুর পাল নিয়ে গোঠে ফিরছে।

বাগান ছাড়িয়ে আধ মাইলটাক দূরে ফাঁকা মাঠের ওপর একটি বহু প্রাচীন পাথরের স্তূপ ছিল। তাকে ঘিরে কত যে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই।

কবে কোন্ অতীত যুগে ভারতের অন্য প্রান্ত থেকে কোন্ ভিনদেশী রাজা এই মুল্লুকে এসে তার দেশজয়ের এই স্মারকস্তম্ভ তৈরী করে রেখে গেছে তা নিয়ে আজও ছেলেবুড়ো সকলের মধ্যেই বাকবিতণ্ডা হয়। সেই বাকযুদ্ধে আলেকজান্দার থেকে বক্তিয়ার খিলিজি কারুর নামই বাদ যায় না।

ইতিহাস যাক, কিন্তু প্রায় একশো ফুট উঁচু এই শিলাস্তূপের ওপর উঠে দাঁড়ালে আশে পাশের গ্রামগুলিকে ছবির মতো সুন্দর দেখায়।

আমরা সেই দিকেই যাচ্ছিলাম।

সহসা শিশুকণ্ঠের কলহাস্য নির্জন স্থানটিকে মুখর করে তুলল।

আমরা তখন শিলাস্তূপটির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

মুখ তুলে দেখি, স্তূপের মাথায় একটি হৃষ্টপুষ্ট বছর চারেকের ছেলে একটা পাথরের থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে কাকে উদ্দেশ করে বলছে, টু-কি। ধরতে পারলে না!

পর মুহূর্তেই ওধার থেকে একটি তরুণী মেয়ে ক্ষিপ্রগতিতে এসে ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরল। তারপর তাদের সে কী হাসি!

দু'জনের কেউই তখনো নীচে আমাদের দেখতে পায় নি।

মেয়েটির বয়স আঠারো উনিশ হবে। ভারী সুশ্রী দেখতে।

তার সারা অঙ্গ ঘিরে লাবণ্যের হিল্লোল, চোখে মুখে প্রাণ-প্রাচুর্যের উচ্ছলতা।

মুগ্ধনেত্রে মাথার ওপর বালক ও তরুণীর সেই ক্রীড়াকৌতুকের দৃশ্য উপভোগ করছিলাম। পাশ থেকে কুমার বলে উঠল, বা, বা, বা। চমৎকার মেয়েটা তো! সীতানাথ, ও তো দেখছি তোমার ছেলে। মেয়েটি কে?

পথে আসতে আসতে সীতানাথের সঙ্গে কথায় কথায় জেনেছিলাম, সে মৃতদার। একটি বছর চারেকের শিশু সন্তান রেখে তার স্ত্রী বছর দুই আগে মারা গিয়েছে।

কুমারের কথায় বুঝলাম, ছেলেটি সীতানাথের সেই মা-হারা সন্তান।

ও হে সীতানাথ!

আজ্ঞে।

উত্তর দিচ্ছ না কেন? মেয়েটি কোথাকার? কাদের বাড়ির মেয়ে?

নীচু গলায় সীতানাথ বললে, এই গ্রামেরই হুজুর। নীলমাধববাবুর মেয়ে।

ওপরের দু'জন ততক্ষণে আমাদের দেখতে পেয়েছে।

ছেলেটি তার বাবাকে দেখে কী যেন বলে উঠল। মেয়েটি তার হাত ধরল। তারপর হাত ধরাধরি করে তারা নীচে নামতে লাগল।

কাছাকাছি হতে দেখলাম, মেয়েটি ঈষৎ বিস্মিত নেত্রে আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হল।

তিনজনের মধ্যে আমিই বোধ হয় ছিলাম তার একান্ত

অপরিচিত। তাই বোধ হয় সে বিশেষভাবে আমাকেই লক্ষ্য করছিল।

কুমার আমার কানে কানে ফিসফিস করে কী একটা মন্তব্য করলে। কিন্তু তা আমার কানে গেল না। তখন আমার মনের মধ্যে একটি সুগভীর অনুভূতি স্পন্দিত হচ্ছিল……চারিদিকে প্রকৃতির স্নিগ্ধ শোভা, মাথার ওপর বৈশাখের ধূসর আকাশ, গাছের শাখায় শাখায় নামনাজানা পাখীর কাকলী—এই পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কবি যেমন করে নারীকে দেখে, তেমনি চোখেই আমি সেই অপরিচিতা মেয়েটিকে দেখছিলাম!

তারা নেমে আসতেই সীতানাথ ডাকল, মল্লিকা।

দু'জনে থমকে দাঁড়াল।

স্নিগ্ধকণ্ঠে সীতানাথ বললে, এদিকে এসো।

ধীরে ধীরে ছেলেটির হাত ধরে মেয়েটি কয়েক পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল।

সীতানাথ বললে, মল্লিকা, ইনি হচ্ছেন কুমার বাহাদুর, আমাদের জমিদার। প্রণাম কর। আর ইনি হচ্ছেন, আমাদের গাঁয়ের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, হুজুরের বন্ধু, বিনায়ক বাবু।

মল্লিকা দু'হাত তুলে প্রথমে আমাকে তারপর কুমারকে নত হয়ে নমস্কার করলে।

ছেলেটি বললে, বাবার কাছে যাব।

মল্লিকা মুখ নীচু করে তাকে বললে—না, এখন বাড়ি চল।

সঙ্গে সঙ্গে বালক আর কোন কথা না বলে মল্লিকার হাত ধরে এগিয়ে চলল।

মন্থরপদে মল্লিকা চলে গেল। আমি নির্নিমেষ নয়নে বহুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম।

প্রস্ফুটযৌবনা সুন্দরী মেয়ে! সেদিন একবারও কি মনে হয়েছিল, সেই শান্ত স্তব্ধ সন্ধ্যা-সন্ধির মুহূর্তে ক্ষণকালের জন্যে যাকে দেখলাম, সেই ললিততনু মেয়েটিই আমার এই বিড়ম্বিত জীবননাট্যের নায়িকার ভূমিকায় দেখা দেবে?

এখন এতদিন পরে, বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে খাতার পাতায় লাইনের পর লাইন তারই কথা লিখে চলেছি আর বাইরে বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারা যেন আমার মনের কথাই বিশ্বময় প্রকাশ করছে।

আকাশে মেঘের গর্জন। গাছের মাথায় আর্ত হাহাকার তুলে ঝড় বইছে। বন্ধ জানলার বাইরে চোখ মেলে সেই ঝড়-বাদলের প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে আমার কল্পনাকে সুদূর অতীতের এক সৌম্যস্নিগ্ধ সন্ধ্যার লগ্নে সঞ্চারিত করি........ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানি নির্মল সরল মুখচ্ছবি, মাধুর্যে সুষমায় অপরূপ এক অনিন্দ্য কান্তি।

॥ দুই ॥

আশ্চর্য এই মানুষের মন।

অন্তরের মধ্যে যার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ আর আকর্ষণ বোধ করি, কখন্ কোন্ ফাঁকে সে যে কাছে এসে দাঁড়ায় তা হয়ত জানাই যায় না।

কোন্ সূত্রে স্মরণ নেই, দ্বিতীয় দিন যখন মল্লিকার সঙ্গে আলাপ হল, তখন মনে হল যেন আমাদের পরিচয় নতুন নয়, আমরা যেন অনেকদিন থেকেই পরস্পরকে চিনি।

মল্লিকার কুণ্ঠাহীন নিঃসঙ্কোচ আচরণ আর মিষ্টি কথাবার্তা আমাকে মুগ্ধ করল।

নানা আলাপের মধ্যে জানলাম, বাপের কাছে মল্লিকা সংস্কৃত ও বাংলা ভাল করেই পড়েছে। ভাল ভাল অনেক বইএর কথা তার জানা।

কথা প্রসঙ্গে সেদিন হঠাৎ বললে, আপনাকে কিন্তু এ জায়গায় এমনভাবে মানায় না।

মৃদু হেসে বললাম, ঠিক কোন্ অর্থে কথাটা বললে, তা বুঝলাম না। পুলিসের চাকরি, বদলি হতে হয়, তাই জায়গা বেছে নেবার অধিকার তো আমার নেই। এখানে আমার বেশ ভালই লাগছে।

মল্লিকা বললে, বন্ধুবান্ধব নেই। একা একা।

একা একা কেন? কুমার বাহাদুর তো রয়েছে।

উনি তো আর সব সময় থাকেন না।

হেসে বললাম, আরও কত লোক আছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেই হল। ধর, তোমরা তো রয়েছো।

দুই ভুরু তুলে মল্লিকা হেসে ফেলল :

আমরা কি আপনার বন্ধুর সামিল ?

নয়ই বা কেন ?

ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বললে, কৈ, আমাদের বাড়ি তো গেলেন না একদিনও।

যাব। কিন্তু তোমার বাবা অসুস্থ মানুষ। তাই হয়ত গিয়ে তাঁকে বিব্রত করব।

না, না। এমনিতে লোকজনের সামনে বাবা খুব স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা বলেন। আপনি তো অনেক বই পড়েছেন। দেখবেন, সেই সব বিষয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি কত খুসী হবেন।

বেশ তো। যাব। কুমার বাহাদুরকেও সঙ্গে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা বলে উঠল, না, না, আপনি একাই যাবেন।

বলেই হেসে ফেলল : তিনি জমিদার মানুষ। আমাদের মতো গরীব প্রজার ঘরে তাঁকে কি মানায় !

হেসে জবাব দিলাম, বুঝেছি। আচ্ছা, তাহলে সীতানাথকে সঙ্গে নিয়ে যাবো।

এবার তার মুখখানা ঈষৎ রক্তাভ হয়ে উঠল। কিন্তু কথায় হারবার মেয়ে সে নয়, বললে, কেন! একা যেতে ভয় করে নাকি ? তাহলে ফাঁড়ি থেকে দু'জন সেপাইও সঙ্গে নেবেন।

এইবারে ভাল বলেছো। হেসে বললাম।

মল্লিকা হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা, চললাম এখন। গ্রামের মেয়ে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দারোগার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলছে, এদৃশ্য দেখলে, এখানকার লোকের রাতের ঘুম নষ্ট হতে পারে।

তাই নাকি। তাহলে অগত্যা এসো।

মল্লিকা লঘুপায়ে মাঠের রাস্তা ধরল। আমি থানার দিকে পা বাড়ালাম।

হঠাৎ আকাশ কালো ক'রে হাওয়া উঠল। আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কায় রাখালের দল গরুর পাল নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে আরম্ভ করল। ঝোড়ো বাতাসের সাঁসাঁ শব্দে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সেদিনও সন্ধ্যার আগে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। কুমার, আমি আর সীতানাথ।

বললাম, আর এগোনো ঠিক হবে না। ফেরা যাক।

ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল।

কিছু দূর তাড়াতাড়ি হেঁটে কুমার বললে, ওহে বিন্দু। আর তো পারা যায় না। হাঁপিয়ে উঠলাম যে। কোথাও দাঁড়ানো যাক, কি বল।

সেই সময় আমরা নীলমাধববাবুর বাড়ির কাছাকাছি এসেছি। দূরে সীতানাথের বাড়ি দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ ঈষৎ উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলাম, বেশ তো, চল না, নীলমাধববাবুর বাড়িতেই ঢোকা যাক। বৃষ্টি সুরু হয়েছে, তাছাড়া যে-রকম মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে, এতটা পথ হেঁটে যাওয়া নিরাপদ নয়।

এই কথা শোনামাত্রই কুমার ভয়ে নিশ্চল হল। বললে, ঠিক বলেছো তুমি। চলো সীতানাথ, আপাতক ওইখানেই যাওয়া যাক ....

কথার মাঝেই সীতানাথ বলে উঠল, ওখানে যাবার কি দরকার হুজুর, আর একটু কষ্ট করে আমার বাড়িতেই চলুন না! ওই যে, কাছেই। ওখানে অপেক্ষা করুন, তারপর বৃষ্টি থামলে ফিরবেন।

তার কথা শুনে হঠাৎ কেন জানি না আমার জেদ বেড়ে গেল।

বললাম, সীতানাথের বাড়ি অনেক দূর। তাছাড়া, নীলমাধববাবুর সঙ্গে পরিচয়টাও হয়নি এখনো। তাই ওঁর ওখানেই যাওয়া যাক।

কুমার ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, বেশ, বেশ, তাই চল।

মল্লিকাদের বাড়ির দরজায় যখন আমরা পা দিলাম তখন প্রবল বেগে ঝড় উঠেছে।

সীতানাথের ডাকাডাকিতে একটি ছোকরা এসে দরজা খুলে দিলে। ভিতরে ঢুকে আমরা সামনের একটা ছোট ঘরে প্রবেশ করলাম। একপাশে একটি ছোট তক্তাপোষ, এদিকে ওদিকে দু'তিনখানা চেয়ার। বোঝা গেল, এটি বৈঠকখানা।

কুমার তক্তাপোষের ওপর বসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। সীতানাথ ছোকরাকে প্রশ্ন করলে, মিঠ্ঠু, দিদিমনি কোথায়?

বুঝলাম, মিঠ্ঠু মল্লিকাদের বালক-ভৃত্য এবং তার কথায় জানলাম, মল্লিকা বাড়ি নেই।

অনতিকালপরেই পিছনদিককার ঘর থেকে মানুষের গলা ভেসে এলো, কে যেন স্খলিত কম্পিতকণ্ঠে হেঁকে উঠল: মিঠ্ঠু, দরজা জানলা বন্ধ আছে তো?

এঘর থেকেই চাকরটি উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিলে, আছে কর্তা, সব বন্ধ আছে।

আবার আওয়াজ এলো: হ্যাঁ, বন্ধ করে রাখ্, চারদিক চাবী বন্ধ করে রাখ্। চোর এলেই আমায় খবর দিবি। খাঁড়া নিয়ে বসে আছি—মা কালীর খাঁড়া। এক এক কোপ—ব্যস।

কুমার ভয় পেয়ে সীতানাথের পানে তাকাল: ব্যাপার কি হে?

সীতানাথ আমাদের আশ্বস্ত করে বললে, ভয় পাবেন না আপনারা। উনিই নীলমাধববাবু। মাথাটা আজ বেজায় বিগড়েছে দেখছি।

কুমার বললে, চোর চোর করে চেঁচাচ্ছেন কেন?

ওই তো ওঁর ব্যারাম। মাথা যখন গরম হয় তখন চোরের ভয়ে অমনি করে চেঁচাতে থাকেন।

সীতানাথ আরও কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরের বাইরে কাপড়ের খস্‌খস্ শব্দ এবং চাবি-চুড়ির ঝন্‌ঝনানি শুনে আমরা সকলেই দরজার দিকে তাকালাম। দেখলাম, দ্রুতপায়ে মল্লিকা সেই ঘরেই ঢুকছিল, হঠাৎ আমাদের ঘরের মধ্যে দেখে গভীর বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দরজার সুমুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই চঞ্চল চরণে সে ঘর থেকে পালিয়ে

গেল। সেইটুকু সময়ের মধ্যেই এক পলক আমার দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র তার মুখের ওপর পুলকিত বিস্ময়ের যে রেখাটি ফুটে উঠেছিল, তা আমি ছাড়া আর কেউই দেখতে পেলে না।

সীতানাথ বললে, ও আপনাদের এখানে দেখতে পাবে ভাবতে পারেনি, তাই অবাক হয়ে গিছল।

আমরা উভয়েই সেকথা স্বীকার করলাম।

একটু পরেই মিঠ্‌ঠু ঘরের দরজার কাছে এসে আমাদের উদ্দেশ্যে বললে, বাবুরা, দিদিমনি শুধোলেন, আপনারা চা খাবেন ?

কুমারের দিকে তাকালাম, সে হাঁ না কিছুই বললে না। সীতানাথের দিকে ফিরে দেখি সে অন্যদিকে চেয়ে আছে।

অগত্যা বললাম, আপত্তি কি। নিয়ে এসো।

ভৃত্য ভিতরে চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সীতানাথ বললে, বৃষ্টি থামল বোধ হয়।

বললাম, কোথায় থামলো ? বেশ ঝমঝম শব্দ শোনা যাচ্ছে এখনো।

কুমার যেন কেমন অসোয়াস্তি বোধ করছিল। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, তুমি না বলছিলে, নীলমাধববাবুর সঙ্গে আলাপ করবে ?

বললাম, রক্ষে কর। এসেই তাঁর যে কণ্ঠস্বর শুনেছি, তারপর আর সে বাসনা নেই।

সীতানাথের দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, আচ্ছা, সীতানাথ, কতদিন উনি এ রকম অবস্থায় আছেন ?

সীতানাথ উত্তর দিলে, উনি যখন প্রথম এখানে এলেন তখনই কিছু কিছু মাথার গোলমাল দেখা গিয়েছিল। মাষ্টারি করে উনি যে সামান্য টাকা জমিয়েছিলেন সে সমস্তই ওঁর দেশের বাড়িতে থাকবার সময় চুরী যায়। সেই থেকেই যেন কেমন হ'য়ে গেছেন। এখানকার ইস্কুলে হেডমাষ্টার হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু বেশীদিন চাকরি করতে পারলেন না। এখন সারাদিনরাত বাড়িতেই থাকেন, পড়াশোনা করেন আর মাঝে মাঝে ওই রকম চীৎকার ক'রে ওঠেন।

বললাম, ওঁর স্ত্রী নেই বুঝি?

আজ্ঞে না। দশ বারো বছর আগেই তিনি গত হয়েছেন।

কুমার প্রশ্ন করলে, তাহলে ওঁদের এখন চলে কী ক'রে?

কথাটা এড়িয়ে গিয়ে সীতানাথ বললে, খুবই কষ্টে চলে হুজুর। এই যে, চা এসে গেছে।

মল্লিকা ঘরে ঢুকল। পিছনে একটি বড় রেকাবিতে তিন কাপ চা নিয়ে এলো ভৃত্য মিঠ্ঠু। তার হাত থেকে চায়ের পেয়ালা তুলে নিলাম।

দেখলাম, মল্লিকা ইতিমধ্যে শুধু চা-ই তৈরী করেনি, নিজের বেশ অবধি পালটে এসেছে। চা এবং তার সাজ, দু'য়ের মধ্যেই পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় পেয়ে তৃপ্তি বোধ করলাম।

অদূরে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে মল্লিকা। আমরা তিনজনেই নীরব। বুঝলাম, আমাদের কারুকেই চেষ্টা ক'রে এই নিস্তব্ধতা ভাঙতে হবে।

বললাম, এমন ক'রে না-বলা-কওয়া তোমাদের বাড়ির

মধ্যে ঢুকে প'ড়ে উপদ্রব করে গেলাম। কিছু মনে কোরো না। হঠাৎ বড্ড বৃষ্টি এসে পড়ল।

ঈষৎ হেসে মল্লিকা জবাব দিলে, বৃষ্টিতে অনর্থক না ভিজে প্রতিবেশীর বাড়ীতে আসা উপদ্রব হবে কেন? তার জন্যে আপনারা যদি 'কিন্তু' বোধ করেন তাহলে আমরা সত্যিই অপ্রস্তুত হব।

কথার বাঁধুনি লক্ষ্য করবার মত। তাড়াতাড়ি বলতে গেলাম, না, না, তা নয় ....

কথা শেষ হল না। বাইরে বিদ্যুৎ চমকের সঙ্গে কক্কড় শব্দে বাজ পড়ল। বাড়ির অপর প্রান্ত থেকে আবার সেই ভারী কণ্ঠস্বর ভেসে এলো: মল্লিকা এসেছিস? মিঠ্ঠু দরজা বন্ধ কর্।

বাপের ডাকে সাড়া দিয়ে মল্লিকা ত্বরিতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার পিছনে সীতানাথও ভিতরের দিকে পা বাড়ালো।

কুমার এবং আমি পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

নীচু গলায় মৃদু হেসে কুমার বললে, দেখ বিন্নু, তুমি যতক্ষণ মল্লিকার সঙ্গে কথা বলছিলে ততক্ষণ সীতানাথটা কী ভীষণভাবে তোমার দিকে চেয়েছিল! নির্ঘাৎ ও মেয়েটার প্রেমে পড়েছে।

বললাম, বিচিত্র কি। অমন মেয়ের সঙ্গে প্রেমে না পড়াই আশ্চর্য।

কুমার বলতে লাগল, সেদিন দেখনি, কার্তিক যখন মল্লিকার নামে বলছিল তখন সীতানাথ কী রকম ভয়ঙ্কর রেগে উঠেছিল! সে কি আর শুধু শুধুই?

উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিলাম এমন সময় সীতানাথ ঘরে এসে



কুমারকে উদ্দেশ করে বললে, হুজুর, বৃষ্টি প্রায় থেমেছে। আর দেরী না করে রওনা দেওয়াই ভাল। আবার যদি চেপে আসে তাহলে আপনার কষ্ট হবে।

কুমার আমার পানে তাকাল।

বুঝলাম, আমরা যে এখানে বেশী সময় থাকি তা সীতানাথের অভিপ্রেত নয়। মনে মনে হেসে বললাম, চল, ওঠা যাক।

তিন

মাস খানেক পরের কথা।

গ্রামের প্রান্তে একটি প্রাচীন দেব-মন্দির ছিল। সেখানে প্রতি বছর এই সময় কি একটা পর্ব উপলক্ষে খুব বড় মেলা বসত। আশপাশের পাঁচ দশখানা গ্রামের নরনারী সেই মেলায় জমা হত। সে এক মহা হৈচৈ ব্যাপার।

সেদিন অপরাহ্ণ-বেলায় সেইদিকেই যাচ্ছিলাম। যাচ্ছিলাম, মেলা দেখতে বা পুণ্য অর্জন করতে নয়, যাচ্ছিলাম, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে।

ও-পাড়ার ডাক্তার বাসুদেব ঘোষালকে সকলেই জানে। ভাল ডাক্তার বলেই শুধু নয়, এমন একজন পরোপকারী মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। বাসুদেবের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। তাকে আমি শ্রদ্ধা করি।

তারই অনুরোধে সেদিন মেলায় যাচ্ছিলাম। সে খবর পাঠিয়েছিল, আমার সঙ্গে তার নাকি জরুরী কথা আছে এবং বিকালে মেলার মাঠে সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

যে-পথ ধরে হাঁটছিলাম, মেলায় পৌঁছোবার সেইটিই একমাত্র পাকা রাস্তা। তারই ওপর দিয়ে গ্রাম্য নরনারীর দল সার বেঁধে চলেছে। ছই-তোলা গরুর গাড়ীরও অভাব নেই।

পথ চলতে চলতে সহসা এমনি একটি গরুর গাড়ির ভিতর

দৃষ্টি পড়তেই চঞ্চল হয়ে উঠলাম। গরুর গাড়ীতে মল্লিকা চলেছে।

আমার দিকে নজর পড়তেই সে দু'হাত তুলে মৃদু হেসে আমাকে নমস্কার করলে। গাড়ি বেশ জোরে ছুটছিল, কথা বলবার অবকাশ পেলাম না, হাসি দিয়ে তার নমস্কারের উত্তর দিলাম।

ক্রমে মল্লিকার গরুর গাড়ী দূর থেকে আরও দূরে চলে গেল। আমরা পরস্পর পরস্পরের পানে স্মিতমুখে চেয়ে রইলাম। শেষে একটা পথের বাঁকে গাড়িখানা অদৃশ্য হল।

কতক্ষণই বা। কিন্তু সেই কয়েক মুহূর্তের দর্শনেই মল্লিকা আমার মনকে যেন দুলিয়ে দিয়ে গেল। লাল রঙের শাড়িখানি আজ তাকে বড় চমৎকার মানিয়েছে। রঙিন কাপড় পরতে মল্লিকা খুব ভালবসে।

তার সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে করতে লাগল। ইচ্ছে করতে লাগল, তার সেই অতলস্পর্শী আনীল দুই চোখের পানে নির্ণিমেষ নয়নে বহুক্ষণ তাকিয়ে থাকি, তাকে সেই বিশ্রী গরুর গাড়ী থেকে নামিয়ে এনে নিজের পাশে নিয়ে পথ চলি ....

সারা পথ মল্লিকা আমার মন জুড়ে রইল।

বিষম ভিড় জমেছে মেলায়।

অদূরে তাঁবু খাটিয়ে তার সামনে মুখে-রং-মাখা একটা লোক টুলের ওপর দাঁড়িয়ে তারস্বরে বক্তৃতা দিচ্ছে, ভিতরে বোধ হয় ম্যাজিক দেখানো হচ্ছে, তাই সে গলাবাজি করে লোক জড়ো করছে।

চারিদিকে নানা রকম দোকান-পাট। তেলেভাজার গন্ধ। ছেলেমেয়েদের কোলাহল।

এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় বাসুদেব!

এদিক ওদিক দেখছি এমন সময় চোখে পড়ল আর-একটি পরিচিত মেয়ে মেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে দেখে মুহূর্তের জন্যে মনটা দুলে উঠল। এই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই সম্প্রতি বাসুদেবের আর আমার মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে।

মেয়েটির নাম সবিতা। একুশ বাইশ বছর বয়স। কলকাতার হোস্টেলে থেকে ম্যাট্রিক পাস করে বাপের কাছে এসে আছে। তার পাশে ওই যে গম্ভীরমুখ প্রৌঢ় লোকটি রয়েছেন, তিনি সবিতার বাবা দুর্লভ রায়।

দুর্লভবাবুর পূর্ব-পুরুষেরা এককালে পাশের গণ্ডগ্রামের ধনী মহাজন ছিলেন। তখনকার দিনে তাঁদের ও-অঞ্চলের রাজা বলা হত। সে দিন গিয়েছে, এখন নামেই তালপুকুর, ঘটি ডোবে না। কিন্তু তার ঝাঁজটুকু দুর্লভবাবুর মধ্যে এখনো বেশ আছে। অত্যন্ত আত্মগর্বে মানুষ এই দুর্লভ রায়। সেজন্যে তাঁকে আমি বরদাস্ত করতে পারতাম না। আমার সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়, কিন্তু আজ আর তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হল না। পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে চলে গেলাম।

দু'চার পা গিয়েছি এমন সময় দেখি—সামনেই বাসুদেব।

আমায় দেখে বলে উঠল, কতক্ষণ ধরে তোমায় যে খুঁজছি তার ঠিক নেই। কোথায় ছিলে?

বললাম, আমিও ঠিক ওই কথাই বলতে পারি।

আমার হাত ধরে বাসুদেব বললে, বেশ, এখন চল, এই ভিড়ের বাইরে গিয়ে প্রাণ বাঁচাই।

মেলা ছাড়িয়ে ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে দু'জনে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম।

একথা-সেকথার পর বললাম, দুর্লভবাবুর ওখানে যাও? সবিতা কেমন আছে?

ঘাড় নেড়ে বাসুদেব বললে, ভালই আছে। তারা আজ মেলায় এসেছে। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

তাই নাকি? কি বলছিল?

বাসুদেব একটু অন্যমনস্কভাবে বললে, তুমি বদলি হয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছ নাকি?

হঠাৎ বদলি হবার কথা? কই, আমি তো কিছু জানি না।

বাসুদেব বললে, ওকথা যাক। কিন্তু তুমি আজকাল আর ওদিক মাড়াও না শুনলাম। কেন বলত? সেই কথা জানবার জন্যেই তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

ও, এই ব্যাপার!

হেসে বললাম, এই কথার জন্যে এত পথ হাঁটা, এত পরিশ্রম?

বাসুদেব বললে, হাসছ তুমি! কিন্তু কথাটা রীতিমতো স্যারিয়স। তোমার সঙ্গে ওঁদের আলাপ হবার পর থেকেই ওঁরা তোমাকে আপনার মতো করে গ্রহণ করেছিলেন। তুমিও সময় পেলেই ওঁদের বাড়ি যেতে। ফলে, সবিতার মন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হল। এ সমস্তই তো আমি জানি।

বললাম, জানবে বৈকি। একদিকে তুমি আমার বন্ধু,

অন্যদিকে ওঁদের বাড়ির ডাক্তার। আমি জানি, দুর্লভবাবু তোমায় বিলক্ষণ পছন্দ করেন।

বাসুদেব কথায় ঝোঁক দিয়ে বললে, আমার কথা থাক। কিন্তু হঠাৎ তোমার এ কী পরিবর্ত্তন। ছ'মাসের ওপর হয়ে গেল, তুমি ওঁদের বাড়ির চৌকাঠ মাড়াও নি। কী যে কারণ তা তুমিই জানো। হঠাৎ ওদের ওপর এতখানি নিষ্ঠুর হয়ে উঠলে কেন?

এ যে রীতিমতো উকিলী জেরা সুরু করলে হে! একজনদের বাড়ি যাই না বলেই আমি নিষ্ঠুর ....

অসহিষ্ণুকণ্ঠে বাসুদেব বললে, বাজে কথা ছাড়? সবিতাকে তুমি এভাবে হেনস্তা করছ কেন? তুমি জানো, সে তোমাকে বিশেষ ....

বাসুদেব কথা শেষ করতে পারলে না। আবেগে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল।

নির্বিকারচিত্তে মড়া কাটায় হাত পাকালে কি হয়, বাসুদেবের মত ভাবপ্রবণ মানুষ খুব কমই দেখেছি। অল্পেতেই তার মন আবেগে স্পন্দিত হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে তার হৃদয়ের গোপন দুর্বলতাটুকুও আমি জানি।

বললাম, শোন, খুব সংক্ষেপে তোমায় আজ কয়েকটা কথা বলে নি। ভালই হল, তুমি আমায় ডেকেছিলে। সবিতা মেয়েটি খুব ভাল। আমার দ্বারা সে আঘাত পায়, তার কোন ক্ষতি হয়, তা আমি কোনদিনই চাই না। কিন্তু যখন দেখলাম, আমার আগে থেকেই তুমি সে-বাড়িতে যাতায়াত কর, আর শুধু যাওয়া আসাই নয়, সেই মেয়েটির প্রতি তোমার মন উন্মুখ .... না, না, এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই — তোমার মনের এই

খবর যেদিন জানতে পারলাম সেদিন থেকে আমি সরে দাঁড়ালাম। তোমার মতো বন্ধুর সুখের পথে অন্তরায় হওয়াই আমার পক্ষে চরম নিষ্ঠুরতা হত।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই সোজা সত্যি কথা শুনে বাসুদেব কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, তোমায় ধন্যবাদ। কিন্তু এ তো আমি চাই নি। আচ্ছা, আজ চলি, গোটা দুই জরুরী কল্ আছে। এ বিষয়ে আর-একদিন তোমার সঙ্গে কথা হবে।

এই বলে বাসুদেব আমার পানে তাকিয়ে হাসল। তারপর কতকটা জোর কদমে মাঠ পেরিয়ে অদৃশ্য হল।

বাড়ি ফেরবার পথে ঘুরে ফিরে বাসুদেবের কথাগুলো মনে পড়ছিল। সেই সঙ্গে সবিতার কথা। সত্যিই তো, কেন তাকে এমন করে দূরে সরিয়ে দিয়েছি? রূপ, গুণ, বংশমর্যাদা? কিসে সে কম? তবে?

এই 'তবে'-র উত্তরে একটা ঘটনা মনে পড়ল। আগেই বলেছি, দুর্লভবাবুর মধ্যে যে মাত্রাছাড়া বংশগরিমা দেখতাম, তা আমার ভাল লাগত না। শুধু তাই নয়, কিছুদিন আগে আমার এক প্রবীণ আত্মীয় আমার কাছে কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছিলেন, দুর্লভবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার পর তিনি তাঁকে নিজের বৈভব আর বংশগর্ব প্রকাশ করে বলেন যে যদিচ তাঁর জামাই হবার কোন যোগ্যতা আমার নেই তা সত্ত্বেও তিনি নাকি কেবল মেয়ের মুখ চেয়ে আমায় দয়া করে জামাই করবেন মনে করছেন, তা নইলে অনেক বড় বড় সুপাত্র নাকি তাঁর দরজায় ধর্ণা দিচ্ছে, ইত্যাদি।

এর পর আর তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখা চলে না। সবিতার প্রতি আমার সত্যিই এমন কোন দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল না যার জন্যে আত্মসম্মানকে খর্ব করতে পারি। তাছাড়া বাসুদেবের কথাও কানে এসেছিল। অতএব সেইখানেই দাঁড়ি টেনে দিয়েছিলাম।

চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালাম। আমার সামনে মল্লিকা।

॥ চার ॥

বললাম, আসা যাওয়ার পথের ধারে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল। গরুর গাড়িটি কোথায়?

মল্লিকা বললে, যাবার সময় তাড়াতাড়ি ছিল বলে গাড়িতে উঠেছিলাম। এখন হেঁটে ফিরতে বেশ লাগছে। গরুর গাড়ীতে চড়ার যে আরাম!

তার মুখের পানে তাকিয়ে বললাম, এই পথের বাঁকে এমন সময় এই দেখা হওয়াটি আমার অনেকদিন মনে থাকবে। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে আজ।

সত্যিই সেদিনের সেই রক্তিমাভ গোধুলি-সন্ধ্যায় তাকে যেন পটে-আঁকা ছবির মতো নয়নলোভন দেখাচ্ছিল।

আমার কথা শুনে মল্লিকা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল:

কী যে বলেন!

ঠিকই বলছি।

তারপর কথা ঘুরিয়ে বললাম, দু'হাত ভরে তো জিনিষ নিয়েছো দেখছি। এত কেনা-কাটার ঘটা কেন?

আমার এই কথা শুনে মল্লিকা আবার যেন লজ্জায় নুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, বাঃ, আপনি জানেন না বুঝি?

ঈষৎ বিস্মিত হলাম: না, জানিনা তো। কি জানবো?

আবার কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বললে, আমার তো আর-

কেউ নেই। কাজেই নিজেই সব করতে হয়। আপনি সত্যিই জানেন না ?

সত্যিই কিছু জানি না।

জড়িত কণ্ঠে সে বললে, আমার যে বিয়ে !

এর বেশী কথা তার মুখ দিয়ে বেরুলো না।

এবার সত্যিই আমার বিস্ময়ের পালা। বললাম, অত্যন্ত সুখবর। কিন্তু কার সঙ্গে ? একলা-একলা তো আর বিয়ে হয় না ?

মল্লিকা হেসে ফেললে ঃ যান, জানেন সব, কেবল আমায় জ্বালাতন করবার জন্যে ....

না, না, বিশ্বাস কর, সত্যিই জানি না। বলো, কার সঙ্গে। নাম না বলতে পারো, বুঝিয়ে দাও।

একটু হেসে, লজ্জা লজ্জা মুখে মল্লিকা আমায় যা বুঝিয়ে দিলে তা শুনে আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। একেবারে যে অপ্রত্যাশিত তা নয়, কিন্তু তবুও যেন ক্ষোভে হতাশায় আর নিষ্ফল বেদনায় দিশাহারা বোধ করলাম।

প্রথমটা কোন কথা খুঁজে পেলাম না। তারপর বলে উঠলাম, সীতানাথ ! তুমি বিয়ে করবে সীতানাথকে ! আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ নাকি ?

আমার কথা শুনে মল্লিকা নিজেও বোধ হয় অবাক হল। বললে, না, ঠাট্টা নয় তো ! আপনি ঠাট্টা বলে মনে করছেন কেন ?

সহসা কেন যে এত উত্তেজিত হয়ে উঠলাম তা নিজেও জানি না, বললাম, তুমি বিয়ে করবে সীতানাথকে ! একথা তামাসা ছাড়া আর কি হতে পারে !

মল্লিকা এবার বিব্রত হল, বললে, সত্যিই তামাসা নয়। তামাসা করে কি এমন কথা বলা যায়? আপনি এতখানি অবাক হয়ে গেলেন কেন তা তো বুঝতে পারছি না।

কিছুক্ষণের জন্যে তার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। ফোটা ফুলের মতো এই কোমলতনু মেয়ের সঙ্গে যতবারই সেই গতযৌবন বিপুলদেহ সীতানাথকে কল্পনা করবার চেষ্টা করলাম ততবারই সেই বিসদৃশ চিত্র আমাকে যেন পাগল করে তুলল।

মল্লিকা ধীরে ধীরে বললে, তাঁর একটু বেশী বয়েস হয়েছে বটে, কিন্তু তিনি খুব ভাল লোক, তাঁকে আমি বিশ্বাস করি।

বললাম, এই বিশ্বাস করাটাই কি পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কথা মল্লিকা?

নয়-ই বা কেন? আমি জানি, তিনি আমায় সুখে রাখবেন। সে সংস্থান তাঁর আছে।

একটু থেমে আবার বললে, ভালবাসার কথা বলছেন? ওসব বইএর কথা। সংসারে কোন কাজে লাগে না। তাঁর বেশ পয়সাকড়ি আছে। আমার কোন কষ্ট হবে না।

তীক্ষ্নস্বরে বলে উঠলাম, এরই মধ্যে এমন ঘোর সাংসারিক বুদ্ধি কেমন করে পেলে? আশ্চর্য তো!

ঠোঁট ফুলিয়ে মল্লিকা বললে, আপনি খালি রাগই করছেন। কিন্তু কেন? তাঁর বয়েস বেশী, আর দেখতে তিনি সুন্দর নন। কিন্তু তিনি আমার বাবাকে সারিয়ে তুলবেন বলেছেন। বলেছেন, সেজন্যে যত টাকা লাগে সব তিনি দেবেন।

মল্লিকা আরও কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার বাবার চিকিৎসার জন্যে কত টাকা তোমার চাই? দুশো, পাঁচশো, হাজার, দু'হাজার? আমি তোমায়

দিচ্ছি, এখনি দেব। মল্লিকা, এ কী কাণ্ড করে বসেছো তুমি!

আমার কথা শুনে মল্লিকা বোধ হল যেন কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল।

তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পথ চলছিলাম। এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম যে কখন্ আমার বাসার পথ ছাড়িয়ে এসেছি, সে খেয়াল হয়নি। মুখ তুলে দেখি, অদূরে কুমারের বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে।

বললাম, আচ্ছা, তুমি বাড়ি যাও। আমি একটু ওদিক পানে ঘুরে যাবো।

আমার মুখের দিকে চেয়ে মল্লিকা কি যেন বলতে চাইল। কিন্তু কী ভেবে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে নতমস্তকে এগিয়ে গেল।

আমি কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মতো সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘরের মধ্যে ঢুকতেই গোপিকারমণ কলকণ্ঠে আমাকে সম্বর্ধনা জানালো : আরে, বিনু যে, এসো, এসো, এসো! খুব গুড্ টাইমে এসেছো। কার্তিক, বিনায়কবাবুর জন্যে জলদি খাবার নিয়ে এসো।

দেখলাম, রীতিমতো মজলিশ। নতুন নতুন লোক।

একপাশে গিয়ে বসলাম।

কুমার বললে, বিনু, এঁরা সব আজ আমার গরীবখানায় পায়ের ধুলো দিয়ে আমায় কৃতার্থ করেছেন। নিশ্চয়ই এঁদের অনেকের সঙ্গেই তোমার পরিচয় আছে?

হয়ত আছে। মনে মনে বললাম, তাহলেও নতুন করে আর-একবার পরিচয় হতে আপত্তি কি? ইনি চন্দনপুরের আড়ৎদার,

রাজীববাবু? নমস্কার, নমস্কার, নাম শুনেছি বৈকি। কত বড় নামজাদা লোক। আর উনি? হ্যাঁ, ওঁকে তো বহুদিন থেকেই জানি। আমার প্রণম্য।

সত্যিই বিস্মিত হয়েছিলাম। যে দুর্লভবাবু কুমার বাহাদুরের নামে বাড়ি মারতেন, সুনীতি আর সুরুচির আদর্শ শিক্ষকরূপে যিনি গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন, কুমারের নিন্দায় যিনি ছিলেন সর্বদা পঞ্চমুখ, সেই নীতিবাগীশ দাম্ভিক দুর্লভ রায়কে গোপিকারমণের মজলিশে দেখবো, তা আমার সুদূরতম কল্পনারও অতীত ছিল।

দুর্লভবাবু যেন আমার মনের কথা জানতে পেরেই বললেন, বছরের এই দিনটিতে আমি নিয়মিত পরিচিত অপরিচিত সবাইকার সঙ্গেই দেখা করতে বেরুই। রাজীব বললেন, চলো, কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে আসা যাক। তাই এলাম।

বেয়ারা এসে আমার সামনেকার টিপয়ের ওপর নানারকম খাবার-সাজানো প্লেট রাখলো। আমি বাক্যব্যয় না করে খেতে আরম্ভ করে দিলাম। ভীষণ খিদে পেয়েছিল।

ছিন্নকথার সূত্র ধরে দুর্লভবাবু বলতে লাগলেন, যাই বলুন কুমার বাহাদুর, এ কিন্তু আপনার অন্যায়। আমাদের কথা হলে ধর্তব্যের মধ্যে আনতাম না। কিন্তু আপনার মতো বিদ্বান প্রতিভাশালী মানুষের পক্ষে এ অন্যায়।

চন্দনপুরের আড়ৎদার মশাই সশব্দে সায় দিলেন, নিশ্চয়, আমিও তাই বলি।

কৌতূহলী হয়ে কুমারকে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি? কী অন্যায় করলে হে?

কুমার উত্তর দিলে, রায় মশায় বলেন এখানে এসে এভাবে

লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা না করে সবাইকার আড়ালে থাকা নাকি আমার পক্ষে অন্যায়।

ও, তাই বল! হ্যাঁ, তা তো বটেই।

মনে মনে হাসি পেল।

কুমার বললে, উনি বেশ একটা আইডিয়া দিয়েছেন। ওঁকে বলছিলাম, এ জায়গাটাতে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগে না, কোন আকর্ষণ নেই বৈচিত্র্য নেই, কেমন যেন ঝিমিয়ে-থাকা ভাব চাদ্দিকে ....

রায় মশায় বলে উঠলেন, উনি কমপ্লেন করছিলেন, জায়গাটি অত্যন্ত ড্যল! ওঁকে বললাম, সে তো ওঁর নিজের দোষে। উনি ইচ্ছে করলেই ওঁর এখানকার জীবন আনন্দে আর বৈচিত্র্যে ভরে তুলতে পারেন।

মুর্গির কাটলেটখানায় শেষ কামড় দিতে দিতে বললাম, তাতো বটেই! তা, কি আইডিয়া দিলেন ওকে?

দুর্লভবাবু সোৎসাহে বললেন, আইডিয়া এমন কিছু নয়। সবার আড়ালে এমন করে যদি আত্মগোপন করে থাকেন, তাহলে তো খারাপ লাগবেই। জীবনে যদি আনন্দ আনতে চান, একঘেয়েমি দূর করতে চান, তাহলে মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করুন। তাই বলে কি আর যার তার সঙ্গে মিশবেন? গ্রামের বিশিষ্ট লোকদের ডাকুন, সম্মেলনের ব্যবস্থা করুন ...

বাধা দিয়ে বললাম, তাতে কী ফল হবে?

কণ্ঠস্বরে রীতিমত জোর দিয়ে দুর্লভবাবু বললেন, এ আবার তুমি জিজ্ঞেস করছ? ওই ধরনের পার্টিতে কত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় হবে বল দেখি! নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যেই তো আনন্দ আর বৈচিত্র্য।

মাথা নেড়ে কুমার বলে উঠল, আপনি যথার্থ কথাই বলেছেন, রায় মশাই। এমন করে চুপচাপ থাকতে ভাল লাগছে না। শিগগিরই আমার এখানে একটা প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করব। সত্যিই তো, মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় না করতে পারলে প্রাণ বাঁচে কেমন ক'রে? রায় মশায়, রাজীব বাবু, আপনাদের শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, পার্টির ব্যাপারে যা কিছু করবার সব আপনাদের করতে হবে, আপনারাই ভরসা।

বলা বাহুল্য, দু'জনেই গদগদ ভাষায় তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কুমারকে আশ্বস্ত করলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁরা বিদায় নিলেন।

হেসে বললাম, যাক, ওঁদের দৌলতে একটা নেমন্তন্ন পাওয়া যাবে আশা করছি, অবিশ্যি যদি ওই রকম রইস-ব্যাপারে নেমন্তন্ন পাবার যোগ্য হই।

কুমার তখন পাশের আলমারি থেকে বোতল গেলাস প্রভৃতি বার করতে ব্যস্ত।

আমার কথায় কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সীতানাথ ঘরে ঢুকল।

সীতানাথকে যেন আজ নতুন করে দেখলাম। একটি পরম পরিতৃপ্তির দীপ্তি তার চোখে মুখে উপচে পড়ছে। তার যৌবন যেন ফিরে এসেছে।

মনিকের সামনে এসে সসম্ভ্রমে সীতানাথ বললে, অনেকগুলো গরুর একসঙ্গে অসুখ করেছে হুজুর। কলকাতা থেকে একজন ডাক্তার আনা দরকার বলে মনে হচ্ছে।

কুমার বললে, আচ্ছা, কাল সকালে লোক পাঠিও। আমি চিঠি লিখে দেব।

বললাম, শুনে খুব খুসী হয়েছি সীতানাথ।

সীতানাথ প্রথমটা বুঝতে পারেনি, বললে, কেন হুজুর ?

বুঝলে না ? তোমার বিয়ের কথা বলছি হে !

সীতানাথ মৃদু হেসে মুখ নীচু করলে।

কুমার উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল কথা বলেছো। (আমার গা টিপে) কি হে, তোমায় সে-দিনই বলেছিলাম, মনে নেই ? আমি ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম। তাইতো হে সীতানাথ, তলে তলে এই কাণ্ড ! আচ্ছা, চালাক লোক বটে তুমি !

সীতানাথ যেন কুণ্ঠায় নুয়ে পড়ল।

কুমার বললে, দাঁড়িয়ে কেন ! বোস, বোস। বলছি বোস না ! খাবে এক গ্লাস ?

ফুর্তির আসরে কুমারের বাছবিচার নেই, চাকর মনিব তখন সমান, সীতানাথের গলা জড়িয়ে ধরে আর কি।

সীতানাথ হাতজোড় করে আপত্তি জানাবার চেষ্টা করলে। কিন্তু কে শোনে তার কথা ? জোর করে কুমার তাকে বেশ খানিকটা ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিলে।

তোমার ভবিষ্যৎ-স্ত্রীর স্বাস্থ্য পান করছি হে। আজকালকার সভ্য যুগে এই হচ্ছে নিয়ম।

এই বলে নিজেও এক দমে চার পাঁচ পেগ্ শেষ করে ফেললে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সীতানাথ বক্তার হয়ে উঠল। হাত জোড় করে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, বেয়াদপি মাপ করবেন হুজুর। কিন্তু ছোট হুজুর (অর্থাৎ আমি) যখন কথাটা পাড়লেন তখন আপনাদের কাছে প্রাণের কথা নিবেদন করি।

সত্যিই, আজ আমার কি আনন্দ হচ্ছে তা বলবার নয়। মনে হচ্ছে স্বর্গেও এর চেয়ে বেশী সুখ নেই। নেই, আলবৎ নেই। আপনারাও যখন বিয়ে করবেন .... আচ্ছা, ধর্মাবতার, কেন বলুন তো আপনারা এখনো বিয়ে করছেন না? জীবন যে আপনাদের বরবাদ যাচ্ছে তা বুঝতে পারছেন না আপনারা? পারছেন না। বিয়ে হল জীবনের সবচেয়ে পবিত্র বন্ধন। জীবনে শান্তি পেতে হলে ....

বললাম, তাই বুঝি তুমি এই বয়সেও আবার সেই পবিত্র বাঁধন নিচ্ছ, সীতানাথ?

কথাগুলোর মধ্যে জানি না কেন নিজের অজান্তেই খানিকটা শ্লেষ মিশে গেল।

আমার কথা শুনে সীতানাথ কিছুক্ষণের জন্যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপর বিনীত মিনতির সঙ্গে আমাকে উদ্দেশ করে বললে, আপনার কথা বুঝেছি হুজুর। কিন্তু আজ আমায় গালমন্দ করবেন না। হয়ত এ আমার পক্ষে উচিৎ হচ্ছে না, কিন্তু মানুষ তো সব সময় লোভ সামলাতে পারে না হুজুর। সেজন্যে ক্ষমা করবেন। তবে একথা জানবেন, বুড়োই হই, আর কুচ্ছিতই হই, ওকে আমি নিজের প্রাণের চেয়ে ভালবাসি. চিরদিন ভালবাসব। ওকে সুখে রাখবার জন্যে আমি কোন চেষ্টার ত্রুটি করব না, হুজুর .... যাই, মাথাটা বড্ড ঘুরছে, হুজুর আমায় এমন করে ....

উঠে দাঁড়িয়ে সীতানাথ কিছুক্ষণ আমার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল, যেন কোন অপরাধের জন্যে সে আমার কাছে মার্জনা চাইছে .... পরক্ষণেই দু'হাতে মুখ ঢেকে সে কেঁদে উঠল।

দু'জনেই শশব্যস্ত হয়ে তাকে ধরে বসালাম।

ব্যাপার কি! এর মধ্যে কাঁদবার কি আছে ?

সীতানাথ নিজেকে সংবরণ ক'রে নিয়ে বললে, বেয়াদপি মাপ করবেন হুজুর, কিছু হয়নি আমার। ওঁর শেষ কথাটা শুনে হঠাৎ যেন আতঙ্কে আমার বুকটা কেঁপে উঠেছিল। ও কিছু নয়। মাপ করবেন। আমি এবার যাই।

ধীরে ধীরে সীতানাথ চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে আমিও উঠে পড়লাম।

সে রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত সীতানাথের শেষ কথাগুলো মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল।

কে জানতো, তার মনের আশঙ্কা এত অল্প দিনের মধ্যেই এমন ভাবে সত্যে পরিণত হবে!

॥ পাঁচ ॥

কয়েকদিন পরে। দুপুর বেলা।

টেবিলের ওপর কাগজপত্র ছড়ানো। অনেক কাজ জমে গিয়েছিল। তাই তিন-চারদিন ধরে কোথাও না বেরিয়ে, কারুর সঙ্গে দেখা না ক'রে বাড়িতে ব'সে ফাইলের পর ফাইল দেখছি আর নোট লিখছি।

কিন্তু তবুও মন মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল। ইচ্ছে করছিল, সব ফেলে রেখে দিয়ে এখনি ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

পাঁচ ছ'দিন আগে সীতানাথের সঙ্গে মল্লিকার বিয়ে হয়ে গেছে।

কুমারের টাকায়, লোকবলে আর হেপাজতে বিবাহ সুশৃঙ্খলে সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বহু লোক নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল। রক্তরাঙা বেনারসী আর নানা অলঙ্কার-পরা মল্লিকাকে সে রাত্রে সত্যিই অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

মল্লিকার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। এর বেশী আর সে কী আশা করতে পারে? এত সমারোহ, এত উপহার, ক'জনার ভাগ্যে হয়, কে বা পায়? মল্লিকা নিশ্চয় সুখী হয়েছে।

কিন্তু না, আমি জানি, মল্লিকার মন শেষ পর্যন্ত এই আনন্দ অনুষ্ঠানে সাড়া দেয়নি।

বিবাহ সভায় তার দু'চোখ যে ভারী দেখাচ্ছিল তা লজ্জায়

নয়, বিষাদে। তার পাণ্ডুর ঠোঁট দুটি যে ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল, তা আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। মল্লিকা শেষ পর্যন্ত এ বিয়েতে সুখী হয়নি। কেন হয়নি ?

বিবাহ চুকে যাবার পরদিন কুমার এই উপলক্ষে এক প্রীতিসম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে শুধু বিশিষ্ট পরিচিত-ব্যক্তিদের নেমন্তন্ন করা হয়েছিল। নিমন্ত্রিত-দের সংখ্যা ছিল অল্প।

বলা বাহুল্য, সেই ভোজে আমি গিছলাম।

যথা সময়ে নিমন্ত্রিতরা এসে সীতানাথকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানালেন। মল্লিকা দু' একবার বৈঠকখানায় এলো। সকলকে নমস্কার করলে। কিন্তু বেশী সময় সে রইল অন্দর মহলে।

কুমারের ফুর্তি সেদিন যেন আর বাধা মানছিল না, সীতানাথকে নিয়ে কত যে হাসি পরিহাস করছিল তার ঠিকানা নেই। অতটা বাড়াবাড়ি আমার ভাল লাগছিল না। আমি বৈঠকখানা থেকে উঠে পাশের বারান্দায় এসে বসলাম।

দুর্লভ রায় সস্ত্রীক ও সকন্যা এসে আসর জমিয়ে বসেছেন। তাঁর সঙ্গে সেই আড়ৎদার-বন্ধু রাজীবলোচন। ও-পাশে ডাক্তার বাসুদেব ঘোষাল। সবিতা এতক্ষণ তারই গা ঘেঁষে বসেছিল, এই মাত্র উঠে অন্দরের দিকে গেল।

আমি একটু দূরে ব'সে যেমন ক'রে দর্শক রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখে তেমনি মন নিয়ে এই সব অতিথি-অভ্যাগতদের লক্ষ্য করছিলাম .... বেশ লাগছিল, নানাজনের নানা ভাবভঙ্গী, নানান ধরনের কথাবার্তা ....

একপাশে ওই যে লোকটি, ওকে কিন্তু আমার ভাল লাগছিল না। প্রথম দিন থেকেই ভাল লাগেনি। লোকটার নাম শুনেছিলাম, শঙ্কর চৌধুরী। চোখের চাহনিতে আর ঠোঁটের বাঁকা রেখায় সদাই যেন সন্দিগ্ধ ভাব। কেন যে সে এমন নিঃসঙ্কোচে কুমারের ঘাড়ে চেপে এ-বাড়িতে শিকড় গেড়ে বসেছে, কুমারের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি—এই সব কথা যখনই মনে হত তখনই ব্যাপারটাকে যেন হেঁয়ালির মতো লাগত।

গানবাজনার পর খাবার পালা।

ওপাশের বারান্দায় লম্বা টেবিল পাতা হয়েছে। সেখানে সকলে গিয়ে সমবেত হলাম।

হঠাৎ কুমার বললে, না, আমরা এমনভাবে খেতে বসতে পারি না। আজকের যিনি হোস্‌টেস্, যাঁর জন্যে এই আয়োজন, তাঁর উপস্থিত থাকা চাই। কি বলেন আপনারা?

সকলেই উচ্চকণ্ঠে তার কথা সমর্থন করলে।

সীতানাথের দিকে তাকিয়ে কুমার বললে, সীতানাথ, দেরী নয়। যাও, ডেকে নিয়ে এসো।

সীতানাথ বিব্রতভাবে মাথা চুলকোতে লাগল।

কুমার তাড়া দিয়ে উঠল। মল্লিকা সেখানে না এলে কেউই খেতে বসবে না।

সীতানাথ তখন আমার কাছে এসে, অন্যে না শুনতে পায় এমনি ফিস্‌ফিস্ গলায় বললে, দয়া ক'রে আমায় উদ্ধার করুন, হুজুর।

উদ্ধার করব? কেন, কি হয়েছে?

আপনি ওকে ডেকে আনুন। আমি ডাকতে গেলে কিছুতেই

আসবে না। কী জানি, সকাল থেকে ওর কি হয়েছে। আপনি যদি গিয়ে ডাকেন তাহলে নিশ্চয় আসবে'।

সীতানাথের দেরী দেখে সকলে তাকে তাগাদা দিচ্ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন। সীতানাথের কাছ থেকে একটি মধুর কাজের ভার পেয়েছি। আপনারা আরম্ভ করে দিন। আমি এখনি তাকে নিয়ে আসছি।

অন্দরের কাছে দালানে গিয়ে এধার ওধার খোঁজ করে এক ঝিয়ের মুখে শুনলাম, মল্লিকা খিড়কি দিয়ে বাগানের দিকে গেছে।

বাগানের মাঝখানে একটি লতাপাতা-ঘেরা বিরামকুঞ্জ ছিল। সেদিকে গিয়ে দেখলাম, তার ভিতরে একটি পাথর-বাঁধানো বেদীর ওপর মল্লিকা বসে আছে। মাথাটি একপাশে হেলে পড়েছে। দু'চোখ বোজা।

আমার সাড়া পেয়ে চমকে চোখ মেলে সে গায়ের কাপড়-চোপড় সামলে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

দেখলাম, মল্লিকার সারা অঙ্গ ঘিরে যেন সমুদ্রের শ্রান্তি, দু'চোখ আষাঢ়ের মেঘলাদিনের মতো ভারী। মল্লিকার হয়েছে কি ?

তার কাছে গিয়ে বললাম, তা হবেনা। আমরা ওখানে আর তুমি এখানে এমন করে লুকিয়ে থাকবে, এ তোমার অন্যায়। চলো, তুমি না হাজির থাকলে, অতিথিরা খেতে বসবে না বলছে। ওঠ।

মাথা নেড়ে মল্লিকা বললে, না আমি যাব না।

আশ্চর্য হলাম : কেন যাবে না ?

সেকথার কোন উত্তর পেলাম না। দেখলাম, তার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে ....

হঠাৎ বলে উঠল, এ আমি কি করলাম, কেন করলাম ?

নিমেষে আমার চোখের সামনে থেকে অস্পষ্টতার কালো পর্দাখানা যেন সরে গেল। তার ওই কয়েকটি কথায় ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিস্কার বোধ হল।

বললাম, হ্যাঁ, সত্যিই তুমি কি করলে! কিন্তু যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরবে না। এখন আর দুঃখ করে লাভ কি বল ?

কাঁপা গলায় আবেগ ঢেলে দিয়ে মল্লিকা বললে, কেন আমি ওকে বিয়ে করতে গেলাম! আমার সব বুদ্ধি কে এমন করে চুরী করে নিলে!

বললাম, সে প্রশ্ন কর তোমার ভগবানকে। এখন ওঠো, ওখানে ওরা সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

মল্লিকা উঠল না, তেমনি আত্মগতভাবে বলতে লাগল, দু'দিন আগে কেন বুঝেও বুঝলাম না। তাহলে তো তাঁর হাতেই নিজেকে সঁপে দিতে পারতাম।

চমকে উঠলাম : কে সে মল্লিকা ?

তেমনি সুরেই মল্লিকা বলতে লাগল, যিনি আমায় ভালবাসেন, যাঁকে আমি প্রথম দেখেই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি, তারপর প্রতি দিন প্রতিটি রাত যাঁকে আমি মনে মনে কল্পনা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু সাহস করে মুখ ফুটে বলতে পারিনি ....

অত্যন্ত কৌতূহল হল। নারীর মুখের এই স্বীকারোক্তি শোনবার লোভ কে কবে সামলাতে পেরেছে ? তার দিকে ঝুঁকে প্রশ্ন করলাম, তুমি কার কথা বলছ ? কে সে মল্লিকা ?

কে? মল্লিকা তার আয়ত দুই চোখ আমার পানে মেলে ধরল। অনির্বচনীয় সে চাহনি। এক মুহূর্ত নীরব রইল। মনে হল, তার দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখের ওপর এসে জমা হয়েছে। মুহূর্তকাল ইতস্তত করে কম্পিত কণ্ঠে বললে, আপনি! হ্যাঁ, আপনিই। আমার সমস্ত দিনরাত্রির ধ্যান, সে তো আপনাকে কল্পনা করেই। কতদিন ....

উদ্দাম মনকে সংযত করে বললাম, আচ্ছা, শুনেছি। এখন ওঠো, চোখ মুছে ফেল। ওখানে ওরা তোমায় খুঁজচে।

এই বলে হাত বাড়িয়ে তার দু'হাত ধরে তাকে তুললাম। আমার স্পর্শ পেয়ে সে যেন কিছুটা সজীব হল, বললে, খুঁজুক গে। আমি যেতে চাইনে।

তারপর আমার হাতের ওপর ভর দিয়ে বললে, জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল, এ জীবনে আমার কামনা করবার আর কিছু রইল না। শুধু বলুন, আপনি আমায় ভালবাসেন, আমার কল্পনা মিথ্যে নয়।

এ কী ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়লাম। এই নিরালা পাতায় ঘেরা কুঞ্জছায়ায় আমার দেহের ওপর স্ফুঠযৌবনা তরুণীর দেহ এলায়িত, তার সর্বাঙ্গ আমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত, তার দুই চোখে মদির আবেশ .... জীবনে এমন সাংঘাতিক ক্ষণ মানুষের ভাগ্যে সচরাচর আসে না।

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, এখন আমাদের যেতে হবে মল্লিকা, ওরা হয়ত আমাদের জন্যে চিন্তায় পড়েছে।

মৃদুল ব্রততীর মতো আমার বুকের ওপর আরো ঘন হয়ে মদালসকণ্ঠে মল্লিকা বললে, পড়ুক গে! বলুন আপনি।

এর পর বাঁধ ভাঙলো। দু'হাতে তাকে আরও কাছে টেনে

নিয়ে মুখের ওপর মুখ রেখে বললাম, বাসি মল্লিকা, তোমার কল্পনা মিথ্যে নয়, তোমায় সত্যিই ভালবাসি।

মল্লিকা তেমনিভাবেই আমার বুকের ওপর এলিয়ে রইল, মৃদুগুঞ্জনে বললে, আর আমার কোন দুঃখ নেই। এখন যদি মরি, তাও একটুও কষ্টের হবে না। কিন্তু যতদিন বাঁচবো, বলুন, আমায় ছেড়ে যাবেন না!

বললাম, যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, নিশ্চয় জেনো, ততদিন তোমায় ছেড়ে যাবো না। কিন্তু কার যেন পায়ের শব্দ পাচ্ছি। সর তো দেখি।

আমার কথা শেষ হবার আগেই দেখলাম, লতাঘেরা বেড়ার ফাঁকে সেই ক্রূরদর্শন শঙ্কর চৌধুরী এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঠোঁটের ওপর বাঁকাহাসি ফুটিয়ে সে বললে, অনেকক্ষণ এসেছি, কিন্তু পাছে আপনাদের আলাপে ব্যাঘাত ঘটে তাই ডাকতে সাহস করি নি।

গায়ের রাগ গায়ে মেরে বললাম, তাই নাকি। অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।

খাওয়া-দাওয়ার পর কুমারকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আমার উত্তেজিত ভাব দেখে সে কিছু অবাক হল, বললে, কী কথা, বল।

বললাম, আমাদের মধ্যে একজনকে বেছে নাও। হয় আমাকে, নাহয়, ওই শঙ্কর চৌধুরীকে। হয় ওকে এখনি তোমার বাড়ি

থেকে বার করে দাও আর বলে দাও ভবিষ্যতে আর কোনদিন যেন তোমার বাড়ি না ঢোকে; নাহয়, আমি এখনি তোমার বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে বলে যাচ্ছি, ভবিষ্যতে আর কোনদিন তোমার বাড়ি আসবো না।

আমার কথা শুনে কুমারের মুখ থেকে চুরোটটা মাটিতে পড়ে গেল।

ব্যাপার কি বিনু! পাগল হয়ে গেলে নাকি?

না। পুরোমাত্রায় প্রকৃতিস্থ আছি। তোমার ওই স্কাউনড্রেল্ স্পাই বদমাস-বন্ধু শঙ্কর চৌধুরীকে আমি আর এক মিনিটও আমার চোখের সামনে দেখতে চাই না। আমাকে যদি বন্ধু বলে স্বীকার কর, ওকে তাড়াও এই দণ্ডে।

কিন্তু ও তোমার করেছে কি?

আমি তোমায় জিগেস করছি, আমাকে চাও, না, ওকে?

কিন্তু এ যে তুমি আমায় মহা সমস্যায় ফেললে।

আমার কথা রাখবে না?

বিব্রতকণ্ঠে কুমার বললে, কিন্তু তা যে অসম্ভব।

বেশ, তোমার সঙ্গে আমার পরিচয়ের এখানেই ইতি। চললাম, গুড্‌বাই।

কুমার ব্যস্ত হয়ে কি যেন বলতে গেল, তার কথায় কর্ণপাত না করে বেরিয়ে এলাম।

সেই যে এসে নিজের কোটরে ঢুকেছি তারপর থেকে ক'দিন যেন বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই ....

লোকে দেখা করতে এসে ফিরে গেছে, সদাশিব বিনা কারণে ধমক খেয়ে সুমুখ থেকে পালিয়েছে ....

গোপিকারমণের বাড়ি যাব না, এই প্রতিজ্ঞা রাখতে তিনচারদিন ধরে যে মানসিক উত্তেজনার মধ্যে দিন কাটাচ্ছি তার ধকলও বড় কম নয়।

কুমারের কথা ভাবতে গিয়ে আর-একজনকে মনে পড়ছে। মল্লিকা। যদি আমার মধ্যে কিছুমাত্র নীতিবোধ বা মনুষ্যত্ব থাকে তাহলে তার সঙ্গে আমার সকল সম্পর্ক ছেদ করাই উচিৎ। সেদিন মুহূর্তের দুর্বলতায় তাকে নিয়ে যে কাণ্ড করেছি, ভবিষ্যতে তার জের টানবার চেষ্টা করলে, দু'জনেই অনতিবিলম্বে একেবারে পাঁকের মধ্যে ডুবে যাব।

সীতানাথকে বিয়ে করে মল্লিকা ভুল করেছে। তার চেয়ে ভুল করেছে সে আমাকে ভালবেসে। এবং এখন যদি সে তার সেই অবৈধ প্রেমকে প্রশ্রয় দেয় তাহলে লোকে তাকে কী বলবে? না, কিছুতেই মল্লিকার সঙ্গে আমার কোন সংস্রব রাখা কর্তব্য নয়। কিন্তু ....

কিন্তু তবুও আমার সকল সত্তা তার প্রতি এক অবাধ্য আকর্ষণে সর্বদা উন্মুখ হয়ে আছে। তাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। যখনই সেদিনের সেই কুঞ্জবনের স্মৃতি আমার মনে জাগছে তখনই আমার দেহমন উদ্বেল হয়ে উঠছে, তেমনিতর আর একটি মিলনের জন্যে আমার অন্তর তৃষিত বোধ করছে।

কুমার আমাকে চিঠির পর চিঠি পাঠিয়েছে, আমার ক্ষমা চেয়েছে, বারবার তার কাছে যাবার জন্যে অনুনয় জানিয়েছে।

তার কোন চিঠির উত্তর দিই নি।

নানা এলোমেলো চিন্তায় কাজে মন বসল না। ফাইলপত্র গুটিয়ে রেখে উঠে শোবার ঘরে চলে এলাম।

পুবদিকের জানলাটা খুলে দাঁড়িয়েছি এমন সময় পিছনে কার লঘু পায়ের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি, মল্লিকা ঘরে ঢুকছে।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, তুমি! তুমি আমার বাড়িতে? কী সাহস তোমার!

হ্যাঁ, আমি। তাড়িয়ে দেবেন নাকি?

মল্লিকা কাছে এসে দাঁড়াল।

ক'দিন ধরে মনের মধ্যে যে অবসাদ বোধ করছিলাম, মল্লিকাকে পেয়ে নিমেষে তা অন্তর্হিত হল। পরম সমাদরে তাকে বিছানার ওপর বসিয়ে মুগ্ধনেত্রে তার পানে তাকালাম। কি বলব তা যেন ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।

চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে মল্লিকা বললে, আপনার বাসাটি ভারী ছোট্ট। ঘরটিও তাই। এত পয়সা রোজগার করেন অথচ এমন গরীবের মতো থাকেন কেন?

মল্লিকা দারিদ্র সইতে পারে না। জন্মাবধি বিলাসিতা আর ধনদৌলতকেই সে জীবনের পরম কাম্য বলে মেনে নিয়েছে। তার ভোগপিপাসু মনের এই লালসা তাকে শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে গেল, তা যদি সে আগে বুঝতে পারতো!

বললাম, সবাই তো কুমার বাহাদুর নয়। যে যেমন। ওকথা যাক। এখন কী মনে করে এই গরীবের ঘরে এলে তাই বল।

মল্লিকা বললে, এখুনি আমায় যেতে হবে। গয়লাবাড়ি যাচ্ছি বলে এখানে এসেছি। ক'দিনের মধ্যে একবারও আমাদের বাড়ি যান নি কেন তাই জানতে এলাম।

উত্তর দিলাম, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাছাড়া কাজেরও খুব চাপ। ভয় নেই। আমি তোমারই আছি।

মল্লিকা রাঙা হ'য়ে উঠল। আবছা গলায় কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় দূর থেকে কর্কশ কণ্ঠের চীৎকার ভেসে এলো :

"খুন করেছে! মেয়েটাকে একেবারে শেষ করেছে। পুলিস ডাকো। পুলিস, পুলিস!"

মল্লিকা শিউরে উঠে দু'হাত বাড়িয়ে আমার একখানা হাত ধরে ফেললে। তার ভীত জিজ্ঞাসু মুখের দিকে চেয়ে হেসে বললাম, ও কিছু নয়। আমার ঠিক পাশের বাড়িতে একটা পাগল আছে। সে-ই যখন-তখন অমন ক'রে চেঁচায়। ভয় পেয়ে গেছ?

ভয় পাবো না? মাগো! কি বিচ্ছিরি চীৎকার! এখনো আমার বুক কাঁপছে। আমি যাই।

এখুনি যাবে কি! এই তো এলে ....

না, আমি যাই। আপনি যাবেন, কেমন! নিশ্চয় যাবেন। চললাম।

নীচে নেমে দরজার কাছ অবধি গিয়ে তাকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে দেখি, ঘরের সামনে গম্ভীরমুখে সদাশিব দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখের ভাব দেখে মনে মনে হেসে বললাম, খবর কি সদাশিব? অমন করে দাঁড়িয়ে কেন?

ভারী গলায় সদাশিব বললে, এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। শেষকালে বাড়ির মধ্যেই! এ কিন্তু চলবে না, দাদাবাবু। ফের যদি ওই মেয়েটাকে এবাড়িতে দেখি তাহলে দেশে গিয়ে কর্তাকে খবর দেব, তা বলে রাখছি।

হেসে বললাম, আচ্ছা, দিস খবর। এখন যা, নিজের কাজে যা, বিরক্ত করিস নি।

সদাশিব আপন মনে বক্‌তে বক্‌তে প্রস্থান করলে।

একখানা মাসিক-পত্রিকা টেনে নিয়ে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিলাম।

একটা গল্পের কিছুটা পড়েছি এমন সময় নীচে কার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। পরিচিত স্বর : বিনু আছে ওপরে ?

আছেন বৈকি। (সদাশিবের গলা) যান, ওপরে যান।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। উঠে বসলাম। পরক্ষণেই কুমার ঘরে ঢুকল।

এই যে।

বললাম, এসো এসো। হঠাৎ এমন সময় ?

বিছানার ওপর বসে আমার দু'হাত ধ'রে ছলছল চোখে কুমার বললে, বিনু, কি করেছি আমি যে তুমি এমন ক'রে আমায় ত্যাগ করছ ?

হাসবার চেষ্টা করে বললাম, আরে না না। কি বলছ তুমি ! ত্যাগ করব কেন ?

করছ না তো কি ! আজ তিন দিন হয়ে গেল, কতবার করে তোমায় ডাকতে পাঠালাম, কিন্তু তোমার দেখা নেই। তোমায় আমি কত ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, আর তুমি আমার বিনা দোষে আমায় এমনি ক'রে ....

তাকে থামিয়ে দু'হাত নেড়ে দিয়ে বললাম, বাস্। আর বলতে হবে না। চল, এখনি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

আমায় জড়িয়ে ধরে কুমার বলে উঠল—তুমি আমায় বাঁচালে। হ্যাঁ, শোন, সেদিন শঙ্করকে খুব যাচ্ছেতাই বলেছি। সে বলেছে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। তাছাড়া, কালই সে এখান থেকে চলে যাচ্ছে।

বললাম, শঙ্কর কি অন্যায় করেছে, তুমি জানো?

না। আমায় কিছু বলেনি।

ভালই। তাকে ক্ষমা চাইতে হবে না। তাকে জানিয়ে দিও, তার ওপর আমার কোন রাগ নেই। তবে ভবিষ্যতে সে যেন সামলে বলে।

ঘাড় নেড়ে কুমার বললে, নিশ্চয় বলে দেব। যাক, তোমাকে যে এমন খোস মেজাজে দেখবো আশা করি নি।

একটু থেমে নীচুগলায় বললে, হ্যাঁ, ভাল কথা, পথে আসতে আসতে মল্লিকাকে দেখলাম। আমায় দেখে হাসলো। দেখ বিনু, সীতানাথকে আমার মোটেই ভাল লাগে না। মল্লিকা যে ওর বউ, এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না।

তারপর আরও চুপি চুপি মল্লিকার সম্বন্ধে তার আসল মতামত এবং অভিসন্ধির কথা আমার কাছে প্রকাশ করলে।

রাগে ঘৃণায় আমার সর্বশরীর রী রী করতে লাগল। কিন্তু তার কাছে রাগ প্রকাশ করাও যেমন নিরর্থক, তাকে ন্যায় অন্যায় কথা বলাও তেমনি পণ্ডশ্রম। তাই তার নির্লজ্জ কথার উত্তরে চুপ করেই রইলাম।

কুমার বলতে লাগল, এখানকার মেয়েদের মধ্যে আর কাকে আমার ভাল লাগে জানো? সবিতা। চমৎকার মেয়ে। ইচ্ছে করে, ওর ঢুলুঢুলু চোখ দু'টির দিকে রাতদিন চেয়ে থাকি। ওখানেও চার ফেলেছি। দেখি কি হয়। মনে করছি, শিগগিরই একটা পার্টি দেব আর তাতে বিশেষ ভাবে ওকে নেমন্তন্ন করব। দেখা যাক, কতদূর কি করতে পারি। আচ্ছা, তাহলে চললাম এখন। তুমি সন্ধ্যের সময় নিশ্চয় আসছো! ঠিক তো! ভুলো না কিন্তু। চলি। টা টা।

॥ ছয় ॥

হেমন্তকাল শেষ হয়ে আসছে।

ভোরের আকাশে কুয়াশার আভাস। বিকালের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শীতের বেলা বুঝি এলো।

এমনি এক দিনের অপরাহ্নে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম।

দিন দুই শরীর ভাল যাচ্ছিল না। বাড়িতেই চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়েছি। কিন্তু এভাবে জড়ের মতো অবরুদ্ধ অবস্থা অসহ্য লাগছিল। সেদিন তাই উন্মুক্ত উদার প্রকৃতির কোলে ফাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে একা একা পথ হাঁটতে ভারী আরাম বোধ হচ্ছিল।

ঘুরতে ঘুরতে সীতানাথের বাড়ির কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, তার বাড়ির সামনে যে ছোট্ট বাগানটুকু আছে সেখানে সীতানাথের ছেলেটি খেলা করছে।

ওদিক পানে চেয়ে দেখলাম, সীতানাথ একটা ঢিবির ওপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। সে আমায় দেখতে পেলে না।

ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, খোকা, তোমার নতুন মা কোথায়?

খোকা খেলা ভুলে আমার পানে তার দুই আয়ত চোখ মেলে ধরল, তারপর সসম্ভ্রমে বললে, মা কুমার বাহাদুরের সঙ্গে বেড়াতে গেছেন।

বললাম, ও তাই নাকি।

মাথা নেড়ে ছেলেটি বললে, রোজই এমনি সময় যান।

সীতানাথ আমার সাড়া পেয়ে মুখ ফিরিয়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললে, হুজুর কি ওর কথা শুনে অবাক হলেন?

তার কাছে গিয়ে বললাম, না, অবাক হব কেন। বেড়াতে গেছে, তাতে আর দোষ কি?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সীতানাথ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমিও তো ওই বলেই মনকে প্রবোধ দি।

সীতানাথের সেই বেদনা-বিক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে অনেক অব্যক্ত কথাই যেন শুনতে পেলাম। বুঝলাম, এমন ক্ষেত্রে যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটতে সুরু করেছে! তার জন্যে এখন দোষ দেব কাকে?

কিন্তু মল্লিকা!

সে কি করে হঠাৎ এতখানি নীচে নেমে গেল! তবে কি বুঝতে হবে, তার মধ্যে চরিত্র বলে কোন বস্তু কোনদিনই ছিল না।

মনের মধ্যে একটা অনির্ণেয় জ্বালা অনুভব করলাম।

সন্ধ্যার পর তারা দু'জনে ফিরল। আমি তখনো সীতানাথের সঙ্গে বসে গল্প করছি।

আমাকে দেখে মল্লিকা কোন কথা না বলে যেন কতকটা ত্রস্তভাবেই বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

কুমার বললে, আরে বিনু, তুমি এ সময়ে এখানে? ভালই হয়েছে, চল আমার সঙ্গে। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে অনেক। বিশেষ জরুরী একটা পরামর্শের দরকার। এসো। ভাবছিলাম, তোমাকে ডাকতে পাঠাবো।

বললাম, চলি সীতানাথ। আবার দেখা হবে।

আসুন হুজুর।

দু'জনে পথে নেমে এলাম।

কুমার একবার পিছনদিকে তাকিয়ে বললে, বিনু, তুমি আমায় কন্‌গ্রাচুলেট করতে পারো।

কেন?

সোৎসাহে কুমার বললে, আর কেন! আর দু'চারদিন এমনি একা একা বেড়াতে যাওয়া, ব্যস, তাহলেই কেল্লা ফতে। হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনলাম নাকি, দুর্লভ রায়ের মেয়ে সবিতার সম্বন্ধে তোমার কিছু দুর্বলতা আছে! সত্যি নাকি?

জিজ্ঞাসা করলাম, কার কাছে শুনলে?

তা আর নাই বা বললাম। তা যদি থাকে তাহলে বল, আমি সরে দাঁড়াই। অপরের ব্যাপারে আমি নাক গলাতে চাই না, বিশেষ এক্ষেত্রে যখন তুমি। অবিশ্যি তোমার যদি কোন রকম অভিসন্ধি না থাকে ....

অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হচ্ছিল। বললাম, না, আমার কোন অভিসন্ধি নেই।

ব্যস, ব্যস, তাহলে ওখানেও কাজ হাঁসিল করতে দেরী হবে না।

এই বলে কুমার সহর্ষে ও সবিস্তারে কেমন করে এক ঢিলে দুই পাখী বধ করা যায় তারই অব্যর্থ ফন্দীর কথা বলতে লাগল।

কী অপরিমিত উৎসাহ! কী অদম্য সাহস।

॥ সাত ॥

তারপর ঘটনার স্রোত সহসা অত্যন্ত দুরন্তবেগে বয়ে চলল।

জল ঘুলিয়ে পঙ্কিল হয়ে উঠল এবং সেই স্রোতের মুখে যারা ভাসতে লাগল, কোথায় গিয়ে কেমন করে কোন্ অনির্দিষ্ট মোহানায় তাদের সেই নিরুদ্দেশ-যাত্রা শেষ হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা রইল না।

আমি নিজে তাদের সঙ্গে এমন অচ্ছেদ্য বাঁধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে শত ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই কর্দমক্লিন্ন স্রোতের মুখ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলাম না। তাদের সঙ্গে আমিও ভেসে চললাম।

ইতিমধ্যে হঠাৎ মল্লিকার বাবা নীলমাধববাবু মারা গেলেন।

একটা তদন্তের ব্যাপারে সে-সময় কয়েকদিন আমি অন্য জেলায় গিছলাম। ফিরে এসে খবর পেলাম।

সীতানাথের বাড়ি গিয়ে শুনলাম মল্লিকা নেই, সে ভিন্‌গাঁয়ে তার এক আত্মীয়ের বাড়ি গেছে।

কয়েকদিন পরে শ্রাদ্ধশান্তি সেরে সে ফিরে এলো। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হল না। বুঝলাম, মল্লিকা আর আমার কাছে আসতে চায় না। কিন্তু কেন? কেন সে এমন করে আমাকে এড়িয়ে চলছে?

এই কেন-র উত্তর খুঁজতে গিয়ে আমার সর্বদেহে যেন আগুন ধ'রে গেল। সেই একই আগুনে পুড়ছে সীতানাথের নতুন বাঁধা ঘর।

সীতানাথ আর তার ছেলেটাকে দেখলে মায়া হয়।

সবিতার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। কথাবার্তাও যে না হয়েছে তা নয়। কিন্তু সে-আলাপের মধ্যে দূরত্বের সুরই যেন বেশী। সবিতাও নিজেকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছে।

কুমারের বাগান-বাড়িতে দুর্লভ রায় আর সবিতাকে আজকাল প্রায়ই দেখা যায়।

সময় এবং সুযোগ পেলেই কুমার সবিতার স্তাবকতা করে। হয়ত তা তার ভালই লাগে।

দুর্লভবাবু প্রসন্ন মুখে তাদের দু'জনকে লক্ষ্য করেন। তাঁর মুখের ওপর মনের যে ভাবটি ফুটে ওঠে তা আমি সহজেই বুঝতে পারি।

এবং এই তো স্বাভাবিক। অমন বিত্তশালী জামাই কে না চায়?

ভাবে বোধ হয়, তিনি যেন আর আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না।

বাসুদেবও বোধ হয় তাঁর লিষ্টি থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

সীতানাথের সঙ্গে দেখা হয়। সে আজকাল আরও কম কথা বলে। লক্ষ করছি, সীতানাথ দিন দিন অধিকতর গম্ভীর হয়ে উঠছে।

তার আগেকার সে শান্ত নম্র চেহারা আর নেই। মুখের ওপর বিষাদের ছায়া আর তার সঙ্গে একটা উগ্র জ্বালা যেন অনুক্ষণ ঠিকরে পড়ছে।

তার ভিতরটা যে দিনের পর দিন ভয়ঙ্কর রাগে ফুলে উঠছে তা আমি বিলক্ষণ বুঝতে পারতাম।

সেই পুঞ্জীভূত আক্রোশ যেদিন ফেটে পড়বে সেদিন কী যে হবে তা ভগবানই জানেন।

সেদিন কুমারের এক মালী আমার জন্যে কিছু ফুল এনেছিল। তার সঙ্গে কথায় কথায় জানলাম, আগের দিন রাত্রে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে খুব ঝগড়া হয়েছিল, মল্লিকা রাগ করে সীতানাথকে যা-তা ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিছল এবং তারপর সারা রাত আর ফেরে নি।

পরদিন সীতানাথকে সামনে পেয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি সীতানাথ, এত ঝগড়াঝাঁটি কেন?

উত্তরে ভগ্নহতাশকণ্ঠে সীতানাথ যা বললে তা শুনে শীর্ণ হয়ে উঠলাম। স্বামী না হয় রূঢ় কথা বলেছিলই, তাই বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে পরপুরুষের ঘরে রাত কাটানো— এ কোথায় নেমে গিয়েছে মল্লিকা!!

কুমারকে কি বলব? পশু সে, এমনি সুযোগই সে হয়ত খুঁজছিল। তার কথা ছেড়ে দি।

কিন্তু মল্লিকা?

তার প্রতি একটা বিজাতীয় বিদ্বেষে অন্তর বিষিয়ে উঠল।

স্পষ্ট মনে আছে, সে-রাতে ঘুমুতে পারিনি। উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরে নিরন্তর মল্লিকার কথাই ভেবেছি। পাশের বাড়ির

পাগলটার পাগলামি রাত বাড়বার সঙ্গে বেড়ে ওঠে। থেকে থেকে সে চীৎকার করছিল ঃ

"খুন করেছে। মেয়েটাকে একেবারে শেষ করেছে। পুলিস ডাকো, পুলিস।"

তার চীৎকার শুনে শিউরে উঠছিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে সীতানাথের সেই ক্রুদ্ধ বিবর্ণ মুখ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল।

পর পর কয়েকদিন দু'তিনটে চোরাকারবার আর বে-আইনী মাল আমদানীর তদন্ত করার কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে রইলাম।

দিন কয়েক পরে একটা ঘটনা শুনলাম ঃ মল্লিকার ব্যবহারে হঠাৎ রেগে উঠে সীতানাথ বুঝি তার গায়ে হাত তোলে। আর অমনি মল্লিকা কেঁদেকেটে কুরুক্ষেত্রকাণ্ড করে কুমারের কাছে গিয়ে নালিশ জানায়।

কুমার বাহাদুর মহিলার প্রতি এমনধারা বর্বরোচিত আচরণ সইতে পারে নি। অভিযোগ শোনামাত্রই সীতানাথকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শোনা গেল, ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে সীতানাথ পাশের গ্রামে চলে গেছে।

ছেলেটা এক আত্মীয়ের বাড়ি আশ্রয় পেয়েছে আর সীতানাথ একটা তাড়ির দোকানে আড্ডা গেড়ে অষ্টপ্রহর নেশায় বুঁদ হয়ে আছে।

অতঃপর কুমার আর মল্লিকার বেপরোয়া জীবনযাত্রায় আর কোন বাধাবন্ধ রইল না।

॥ আট ॥

শীতের আমেজ-লাগা অপরাহ্ণ।

কুমারের বাগানে সেদিন এক বিরাট পিক্‌নিকের আয়োজন হয়েছে।

কলকাতা থেকে বাবুর্চি এসেছে, হালুইকর এসেছে, তরিতরকারি মাছমাংস এসেছে আর এসেছে ফ্রাম্‌জির দোকান থেকে নানা রকমের দুষ্প্রাপ্য আর দুর্মূল্য পানীয়। তাদের অবিশ্যি লোকচক্ষুর আড়ালে কুমারের খাসচাকর কার্তিকের হেপাজতে রাখা হয়েছে।

মধ্যে কয়েকদিন জরুরী কাজের চাপে কুমারের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তাছাড়া আজকাল আর তার কাছে যাবার ইচ্ছেও বিশেষ হত না। এই পিকনিক-এর ব্যাপারে সে নিজে এসে বিশেষ করে বলে গিছল এবং আমিও কতকটা কৌতূহলী হয়ে ব্যাপারটা কি রকম জমকালো হয় দেখবার জন্যে সেখানে হাজির হয়েছিলাম।

•

যথাসময়ে একে একে নিমন্ত্রিতরা এসে উপস্থিত হলেন।

চন্দনপুরের আড়ৎদার রাজীববাবুর স্ত্রী ও কন্যার সঙ্গে পরিচয় হল। কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে আলাপ করেই হাঁপিয়ে উঠলাম।

লনের একধারে একটি বাওয়ার-এর তলায় সবিতা একা বসেছিল। তার প্রসাধনের পারিপাট্য লক্ষ্য করবার মতো।

ওধারে চেয়ে দেখলাম, পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে মল্লিকা যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। সাজগোজের বাহারে আর উদ্ধত যৌবনের হিল্লোলে তাকে যেন দুর্লভ সুরাসারের মতোই লোভনীয় মনে হচ্ছিল।

সবিতা যে কখন্ এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল টের পাই নি। সহসা তার কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙলো। মুখ ফিরিয়ে বললাম, আমায় কিছু বলছিলে ?

মৃদুস্বরে সে বললে, না, এমনি এদিকে এলাম। একা একা বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। আপনাকে দেখে উঠে এলাম। এঁরা সব গেলেন কোথায় ? আপনি এত তন্ময় হয়ে কি দেখছিলেন ?

উল্টো পালটা দুটো প্রশ্ন এক সঙ্গে।

এঁরা অর্থে সবিতা কাকে নির্দেশ করল তা বুঝতে দেরী হল না। বললাম, কুমার বোধ হয় রান্নার তদারক করতে ভিতরে গেছে। আমি একমনে কি দেখছিলাম জানো ? দেখছিলাম ওই মেয়েটিকে। কি অদ্ভুত ওর জীবন।

মুখ কুঁচকে সবিতা বললে, মল্লিকার কথা আর বলবেন না! ওর মত ভীষণ খারাপ মেয়ে জীবনে দেখিনি। ওকে দেখলেই ঘেন্না বোধ হয়। আচ্ছা, ওর স্বামীর কি হয়েছে জানেন ?

জানি। সে আছে পাশের গাঁয়ে। তাড়ির দোকানে পড়ে পড়ে নেশা করছে।

সবিতা বললে, দেখুন তো! ওই মেয়েটার জন্যেই তো লোকটির আজ এই দুরবস্থা। বাবাও তাকে একদিন ওই রকম অবস্থায় দেখেছিলেন। কুমার বাহাদুর কি রকম ভাল লোক

শুনুন, বাবার মুখে খবর পেয়েই তাকে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। এর বেশী তিনি আর কি করতে পারেন বলুন? ওরকম হতচ্ছাড়া লোককে তো আর কাজে রাখতে পারেন না!

ঘাড় নেড়ে বললাম, তা তো বটেই। হ্যাঁ, কুমারের মতো ভাল লোক এখনকার বাজারে মেলে না। শুনলাম, তোমার সঙ্গে আজকাল তার নাকি খুব ঘনিষ্ঠতা।

সবিতা উত্তর দিলে, তাতে দোষের কি?

দোষের কথা বলছি না। লোকে নানা রকম বলছে তাই কথাটা তুললাম। লোকে তার নামে নানা রকম অপবাদ দেয় কি না ....

আমার কথা শেষ হবার আগেই সবিতা বলে উঠল, জানি, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না। লোকে তাঁর ভাল দিকটা তো দেখেনি, তাই অমনধারা যা-তা বলে।

তুমি দেখেছো বুঝি?

নিশ্চয় দেখেছি। তা না দেখলে আর তাঁর মনের ভাব না জানলে কখনো তাঁর সঙ্গে মিশতাম না।

মনে মনে বললাম, ওহো! তার মনের ভাব অবধি যখন বুঝে ফেলেছো তখন তোমার মুক্তির আর দেরী নেই। মুখে বললাম, বেশ, বেশ, অনেকদূর এগিয়েছো দেখছি।

সবিতাও আজ পিছু হটবার পাত্রী নয়, সঙ্গে সঙ্গে বললে, হ্যাঁ, তা এগিয়েছি। আজ আপনাকে বলতে একটুও লজ্জা নেই যে তিনি যদি আমায় বিয়ে করতে চান, আমি আনন্দের সঙ্গে রাজী হব। আপনি আশ্চর্য হবেন না, এ বিয়েতে আমি সুখীই হব। দোষ থাকলেও তাঁর মধ্যে যে মনুষ্যত্ব আছে তাকেই আমি জাগিয়ে তুলবো।

হায় হায়। এ যে একেবারে রীতিমত কাঞ্চনরঙ্গ। সত্যি! টাকায় কি না হয়! পৃথিবীটা কার? পৃথিবী টাকার।

কোথায় ভেসে গেছে বেচারা বাসুদেব। কোথায় তলিয়ে গেছি আমি।

এত দিনে কুমার গোপিকারমণের মধ্যে সবিতা তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে।

আরও দু'চার কথার পর সবিতা বোধ করি তার মনের মানুষের খোঁজেই বাড়ির দিকে চলে গেল।

কয়েকটা পাখী শিকার করা হয়েছিল। মরা এবং আধমরা অবস্থায় সেগুলি পুকুরের পাড়ে পড়েছিল। যেগুলো মরে বেঁচে গিয়েছিল তাদের জন্যে যত না হোক, যেগুলো আধমরা হয়ে তখনো যন্ত্রণায় ছটফট করছিল সেই রক্তাপ্লুত ক্ষীণপ্রাণ পাখী গুলোকে দেখলে সত্যিই দুঃখ হয়।

দূর থেকে লক্ষ্য করলাম, মল্লিকা সেখানে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাদের দিকে চেয়ে আছে।

কাছে গিয়ে বললাম, ওই অসহায় কোমল জীবগুলিকে এমন আধমরা অবস্থায় ফেলে রাখার চেয়ে নিষ্ঠুরতা বুঝি আর কিছু নেই। নির্বিকারচিত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের যন্ত্রণা দেখছো কি করে? তোমার মায়া লাগছে না?

আমার দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে মল্লিকা বললে, অন্য অনেকেই এ পৃথিবীতে যন্ত্রণা সহ্য করছে। ওরাও করুক।

অন্য আবার কে যন্ত্রণা সহ্য করছে গো?

কোন জবাব পাওয়া গেল না। বললাম, কি গো, কথা বলছ না কেন?

আজ আমাকে রেহাই দিন, মল্লিকা ঝেঁজে উঠল, আপনার সঙ্গে কথা বলতে আজ আমার মোটেই ভাল লাগছে না। আপনি দয়া করে এখান থেকে চলে যান।

তার দু'চোখে একই সঙ্গে একটা রূক্ষ জ্বালা এবং সজল ছায়া লক্ষ্য করলাম। তার ডালিমফুলের মতো রাঙা ঠোঁট দুটি শাদা হয়ে গেছে, চোখের পাতা কাঁপছে।

শ্লেষের সঙ্গে বললাম, তাই নাকি! আর ভাল লাগছে না বুঝি? এতদিনের এত প্রণয় এর মধ্যেই সব উবে গেল?

আপনি যান। যান বলছি এখান থেকে।

যাচ্ছি, যাচ্ছি। কিন্তু তোমার অবস্থা দেখে যে বড্ড ভাবনা লাগছে। হল কি তোমার?

ঘাড় নেড়ে মল্লিকা বললে, কিছু হয়নি। আমি খারাপ, আমি ....। আপনি আমাকে তাই মনে করেন, আমি জানি। বেশ তো যান, যেসব সাধু-মেয়ে আছে তাদের কাছেই যান। আমি নষ্ট, আমি ....

তার কথা শেষ হ'ল না। বলে উঠলাম, হ্যাঁ, তুমি নষ্ট। এখানে যারা আছে, যাদের প্রতি তুমি ইঙ্গিত করছ তাদের পায়ের নখের যুগ্যিও তুমি নও। তুমি অতি হীন, নীচ, জঘন্য।

সহসা অপরিসীম ক্রোধে আমার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। এক সময় যেমন একাগ্রমনে তাকে ভালবেসেছিলাম, এখন তেমনিই সারা অন্তরে তার প্রতি নিষ্করুণ সঘৃণ রাগে উগ্র হয়ে উঠলাম।

সামনে দাঁড়িয়ে ওই যে অনিন্দ্যসুন্দরী নারী, জগতের কত কল্যাণই না সে সাধন করতে পারতো! কিন্তু তার বদলে

আমার স্ত্রী। বিমলা, এঁরা সবাই আমার বন্ধু। ইনি দুর্লভবাবু। হ্যাঁ। আর এর কথা তোমায় তো কতবারই লিখেচি। বিনু আমার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। হুঁ········ আজ সকাল থেকে এমন কাশি হয়েছে ····

খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে কুমার অস্থির হয়ে উঠ্‌ল।

তারপর আমি আর সেখানে দাঁড়াইনি।

মনে আছে, কুমারের কথায় সকলেই অল্পবিস্তর বিস্মিত হয়েছিল। আমিও বাদ যাইনি। কিন্তু বজ্রের মতো সেই সংবাদ স্তম্ভিত এবং অভিভূত করে দিয়েছিল বিশেষ করে দু'জনকে — দুর্লভ রায় এবং তাঁর কন্যা সবিতা। কুমারের স্ত্রীকে দেখে তাঁদের মুখের ভাব কি রকম হয়েছিল তা আমি না দেখলেও অনুমান করতে পারছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চলতে লাগলাম। কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছি? কোন ঠিকঠিকানা নেই।

মনে আছে, একটা পায়ে-আঁকা পথ ধরে যেদিকে দু'চোখ নিয়ে যায় সেই দিকেই এগিয়ে গেলাম ···· *

···· ···· ····

যখন ফাঁকা পথের ওপর এসে দাঁড়ালাম তখন যেন অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পায়ে কাদা লেগেছে, ধূলোয় ফর্সা জামা

---

* মন্তব্য: এইখানে সুশান্ত মিত্রের পাণ্ডুলিপিতে অনেকটা অংশ কাটা হয়েছে দেখা গেল। দেখলাম, লেখক অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশ লাইন কেটে মুছে ফেলেছেন।

—সম্পাদক, নবকেতন।

মলিন হয়ে গেছে—কে যেন আমায় ধরে বেদম প্রহার করেছে, সারা দেহ বেদনায় যেন টনটন করছে .... *

....

ঝিলের পাশ দিয়ে পথ। দেখলাম, অসময়ে উত্তাল হাওয়ায় ঝিলের জল তোলপাড় করছে। ঘোর অকালে পশ্চিম আকাশে মেঘের ঘনঘটা। তীক্ষ্ণ শীতল বাতাসে হাড়ের মধ্যেও কাঁপন ধরছে। আমার সুমুখে বিস্তৃত জলাশয়ের ক্ষুব্ধ গর্জন, পিছনে আলোড়িত বনভূমির মর্মরধ্বনি। মনে হল যেন ক্রুদ্ধ প্রকৃতির সামনে অপরাধীর মতো আমি একা। আমার মনের মধ্যেও ঝড় বইছে।†

....

বাসায় ফিরে কাপড়জামা না ছেড়েই শুয়ে পড়লাম। সদাশিব গম্ভীরমুখে কাছে এসে দাঁড়াল। বিড়বিড় করে কত কি বকতে লাগল। তার ধারণা আমি নেশা করেছি।

খানিক পরে ঘুমিয়ে গেছি ভেবে সদাশিব চলে গেল। আমি বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম।

মানসিক ও শারীরিক অবসাদে আমার দেহ মন বিবশ বিপর্যস্ত। ক্লান্তিতে ঝিমোতে লাগলাম। মনে হল, চোখের সামনে ঘন হয়ে কুয়াশা নামছে .... বুঝি স্বপ্ন দেখছি ....

শীতের সকালে কলকাতা সহরের পরিচিত রাস্তা দিয়ে হাঁটছি—একা। কাজকর্ম কিছু নেই, হালকা মন আনন্দে মশগুল।

---

* মন্তব্য : এইখানে আবার অনেকগুলো লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা কথা পড়তে পারা যায়, যথা, 'দু'চোখে কি যেন', 'সর্বশরীর', এমনি আরও দু'একটা শব্দ।—সম্পাদক, নবকেতন।

† মন্তব্য : আবার কয়েক লাইন কাটা।—সম্পাদক, নবকেতন।

চলতে চলতে একটি বড় দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়ালাম। তার ভিতরে থরে থরে মেয়েদের কাপড় সাজানো। দেখতে দেখতে মনে হল, একটা কাঁচের ঘরের মধ্যে মল্লিকা বসে আছে। আর একটায় সবিতা। দূরে ওটায় কে? চিনেছি— কুমারের স্ত্রী। তিনজনেই আমায় দেখে হাসিমুখে অভিবাদন করল। তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। এমন সময় পিছন থেকে কে যেন চীৎকার করে উঠল:

"খুন করেছে। মেয়েটাকে একেবারে শেষ করেছে। পুলিস ডাকো। পুলিস।"

শিউরে চেঁচিয়ে উঠলাম। সদাশিব ঘরের মধ্যে দৌড়ে এলো। উঠে বসে তার কাছে খাবার জল চাইলাম। অত শীতেও আমার কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে।

পাশের বাড়ীর পাগলটা আবার চীৎকার করে উঠ্‌ল:

"খুন করেছে। পুলিস, পুলিস।"

রাত বাড়তে লাগল। বাইরে একটানা বৃষ্টির শব্দ।

ঘুম এলো না। সার্সির বাইরে বর্ষণমুখর অন্ধকার পৃথিবীর পানে চোখ মেলে বসে রইলাম। তারা সবাই এখন কি করছে? কুমার? তার স্ত্রী?........দুর্লভ রায়টা আচ্ছা জব্দ হয়েছে যা হোক। বেশ হয়েছে।

মল্লিকা?

কাঁচ ভেদ ক'রে যেন ঠাণ্ডা আসছে। সারা দেহ হীম হয়ে যাচ্ছে। হাতপা অবশ।*

*মন্তব্য: এইখানকার পাণ্ডুলিপি আবার কাটাকুটিতে ক্ষতবিক্ষত।—সম্পাদক, নবকেতন।

....

সহসা সার্সির বাইরে কার যেন ছায়া পড়ল।

ভয় পেয়ে অন্য একটা জানলা খুলে চেঁচিয়ে উঠলাম, কে ? কে ওখানে ? কি চাও ?

সাড়া এলো, হুজুর।

বললাম, কে তুমি ? এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে এখানে কেন ?

ছায়ামূর্তি মানুষেরই। এগিয়ে এসে বললে, হুজুর, আমি কুমার বাহাদুরের খানসামা। তিনি আপনাকে চিঠি পাঠিয়েছেন। বাগানে মানুষ খুন হয়েছে হুজুর। তারই খবর।

দরজা খুলে তার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে পড়লাম ঃ

"এখনি চলে এসো। মল্লিকা খুন হয়েছে। এখনো বেঁচে আছে। তবে আর বেশীক্ষণ থাকবে না। আমার মাথার ঠিক নেই। মনে হচ্ছে পাগল হয়ে যাবো। শিগগির এসো।

—গোপিকারমণ।"

মল্লিকা! মল্লিকা খুন হয়েছে! বেঁচে আছে কি না ঠিক নেই ....

মাথা ঘুরতে লাগল। বৃষ্টির শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। চোখের সামনে অসংখ্য তারা। পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে ....

নয়

কিছুক্ষণের মধ্যেই কুমারের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

চারিদিকে অপার্থিব স্তব্ধতা। কারুর মুখে কথা নেই। সকলেই যেন দম দেওয়া পুতুলের মতো ঘোরাফেরা করছে।

সামনের ঘরে কুমারের স্ত্রী আর শঙ্কর চৌধুরীকে দেখলাম। দু'জনেই স্তব্ধ গম্ভীর।

শঙ্কর চৌধুরীকে দেখেই আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন জ্বলে উঠল।

পাশের ঘরে কুমার একা বসেছিল। অত্যন্ত উদ্‌ভ্রান্ত। অস্বাভাবিক নয়। এমন ধারা অপ্রত্যাশিত ভীষণ দুর্ঘটনায় তার মতো ভীতু মানুষ যে ভেঙে পড়বে তাতে আর আশ্চর্য কি। আমাকে দেখে সে যেন জীবন পেল, আমার দু'হাত ধরে জড়িত ব্যাকুল কণ্ঠে কত কি যে বললে তার সবটা বুঝতে না পারলেও, এইটুকু বোধগম্য হল যে যতক্ষণ না এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের একটা কিনারা হয় ততক্ষণ যেন আমি তাকে ছেড়ে না যাই।

কথা দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলাম।

কুমার বলতে লাগল, এমন ব্যাপার ঘটবে, কে ভেবেছিল! উঃ। আহা, বেচারী। ডাক্তার এসেছে, বলছে, আজ রাত কাটবে না। তার ওপর আবার এই সময় উনি, মানে, আমার স্ত্রী এসে হাজির। বিপদের ওপর বিপদ। ওকে লাকনৌ-এ বিয়ে

করেছিলাম—সে আজ প্রায় সাতবছর আগেকার কথা। কী ভুলই যে করেছিলাম তা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছি।

একটু থেমে সে আজকের দুর্ঘটনার বিবরণ দিতে লাগল ঃ নিমন্ত্রিতরা উপস্থিত, সকলে গল্পগুজব করছে, সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এমন সময় হঠাৎ তার স্ত্রী এসে পড়ল ....

.... সেই দমকা বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই সকলে একটা তীক্ষ্ণ হৃদয়ভেদী চীৎকার শুনে চমকে উঠল। বনের ভিতর থেকে সেই আর্তস্বর ভেসে এসেছিল। স্ত্রীলোকের মর্মভেদী আর্তনাদ ....

.... সকলে ত্রস্তপদে ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। এমন সময় দূর থেকে একজন বেয়ারা ছুটতে ছুটতে এসে বললে, বাগানের মধ্যে খুন হয়েছে।

.... খুন হয়েছে! কে খুন হয়েছে?

.... বেয়ারাটা সে-প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই চোখের সামনে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেল। প্রথমে গাছের আড়ালে ভারী পায়ের শব্দ—কে যেন বনের গাছপালা সরিয়ে এদিকেই আসছে। তারপর সবাই আতঙ্কে শিউরে উঠে দেখলে, রক্তমাখা হাতে একটা লোক তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দু'চোখ রক্তবর্ণ। সারা দেহ থরথর করে কাঁপছে। তার দু'হাতে জামায় কাপড়ে তাজা রক্তের চিহ্ন ....

.... কুমারের মনে হল যেন এক নিমেষে তার পা দুটো মাটিতে বসে গেছে। তার সুমুখে রক্তমাখা সীতানাথ! সেই সীতানাথ! তার বিশ্বাসী প্রভুভক্ত গোমস্তা সীতানাথ! নম্র ভদ্র শান্তপ্রকৃতির সীতানাথ! তার আজ এ কী মূর্তি!

.... কয়েক মুহূর্ত সীতানাথ নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে

রইল। তারপর মাটিতে বসে পড়ে বিকৃতকণ্ঠে কেঁদে উঠল। দু'হাতে মুখ ঢেকে বললে, মল্লিকা, মল্লিকা, একী কাণ্ড করেছো তুমি! এ কী হ'ল!

.... কান্নার আবেগে তার সর্বশরীর দুলে দুলে উঠছিল। যখন সে মুখ থেকে হাত সরালো, তখন সকলে আর-এক দফা শিউরে উঠল ঃ তার কপালে গালে মুখে রক্তের ছাপ লেগেছে।

এই অবধি বলে কুমার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপর আবার বলতে স্থুরু করলে ঃ আমার তখন যে কী অবস্থা তা বলে বোঝানো যাবে না, চোখের সামনে সবকিছু যেন ধোঁয়ার মতো অস্পষ্ট হয়ে গিছল। মাথা ঘুরছিল। পা টলছিল। তারপর কি হল তা ভালো ক'রে এখন আর কিছু মনে করতে পারছি না। শুধু এইটুকু মনে পড়ছে, কয়েকজন ধরাধরি করে একজনকে বনের মধ্যে থেকে নিয়ে এলো। আমি সেদিকে চেয়ে দেখতে পারি নি। পরে সবাই বলাবলি করছিল, যে ছোট বাঁকানো ছুরিখানা তার চাবির রিংএর সঙ্গে বাঁধা থাকতো সেই ছুরি দিয়ে কে যেন তার বুকের পাঁজরে বারবার মেরে শেষকালে ছুরিখানাকে আগাগোড়া বুকের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছে। ছুরিটা নিশ্চয় তোমার মনে আছে—সোনা বাঁধানো, হাতলের ওপর পাথরের কাজ করা। পশ্চিম থেকে এনেছিলাম, সৌখীন জিনিষ। কিন্তু ধার ছিল ক্ষুরের মতো। কয়েকদিন আগে তাকে উপহার দিয়েছিলাম। কে জানতো বল, তা দিয়ে এমন ভীষণ কাণ্ড হবে?

বকতে বকতে কুমার অবসন্ন হয়ে পড়ল। দুর্বলকণ্ঠে বললে, আমার সমস্ত শরীর এখনো ঝিমঝিম করছে, যা কিছু করবার কর ভাই, আমার মাথা গুলিয়ে গেছে। এই সময় আবার ওই শমন

এসে হাজির—আমার স্ত্রীর কথা বলছি। সে কোথায়, দেখেছো তাকে ?

বললাম, পাশের ঘরে বসে আছেন। সঙ্গে শঙ্করবাবু আছেন।

শঙ্কর! ও, হ্যাঁ, তোমায় বলিনি এতদিন—শঙ্কর ওর মামাতো ভাই। ওই আর-এক সয়তান। বিয়ে করবার কিছুদিন পরেই ভয়ঙ্কর দজ্জাল আর খাণ্ডার স্ত্রীর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে লাকনৌ থেকে যখন পালিয়ে আসি তখন থেকে ও আমার পিছু পিছু আছে। কত টাকাই যে ও আমার কাছ থেকে নিয়েছে তার ঠিক নেই। সোয়াইন।

শঙ্কর চৌধুরীর আসল পরিচয় এতদিনে উদ্‌ঘাটিত হল। তার সন্দিগ্ধ-আচরণের রহস্যও সঙ্গে সঙ্গে বোঝা গেল।

একটু পরে বললাম, আচ্ছা, তুমি বোসো। আমি আমার কাজ করিগে।

আমার হাত ধরে কুমার বললে, শোন বিন্দু। সীতানাথ আমাকেও হয়ত—জানো তো আমার ওপর কী রকম জাতক্রোধ আছে ওর।—আমাকেও ও খুন ক'রে ফেলবে না তো ?

তোমাকেও মানে ? মল্লিকাকে তাহলে কি সীতানাথ খুন করেছে ?

নিশ্চয়। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, ঠিক ওই সময় সে ওখানে এলো কেমন ক'রে ?

তাকে বাধা দিয়ে বললাম, এসব বিষয়ে তুমি কিছু বুঝবে না। হ্যাঁ, দেখ, একটা কথা তোমায় বলে রাখি। চাকরির খাতিরে আমাকে তদন্ত করতে হবে। সুতরাং কোন অবান্তর কথা

বলো না। আমি যখন যা জিগেস করব, শুধু তার উত্তর দিও। ভাল কথা, সীতানাথ কোথায় ?

তাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

ভালই হয়েছে, বলে আমি কুমারের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

দশ।

অন্দর-মহলের দিকে মল্লিকাকে যে ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছিল সেই ঘরে ঢুকলাম।

মেঝেয় বিছানা পাতা—তারই ওপর সে শুয়ে আছে। দূরে একটা তেপায়ার ওপর এক জোড়া বাতি জ্বলছে। আলো অপ্রচুর। তবুও দেখলাম, মল্লিকার মুখখানা যেন কাগজের মতো সাদা। দু' চোখ বোজা। জ্ঞান আছে কি না বোঝা গেল না। তার কাপড়-চোপড় তখনো বদলে দেওয়া হয়নি। দেবেই বা কে? দেখলাম, একখানা দামী শাল তার দেহের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় ডাক্তার বিরূপাক্ষ তলাপাত্র একটা কাপে করে মল্লিকার মুখে ওষুধ ঢালবার চেষ্টা করছিলেন। আমাকে দেখে কাপটা মাটিতে রেখে বলে উঠলেন, মশায়, বলতে পারেন, এ বাড়ির কর্তা কে?

বললাম, কেউ না। এখানে বিশৃঙ্খলার রাজত্ব।

তলাপাত্র বললেন, তাই তো দেখছি। প্রায় একঘণ্টা হতে চলল মশায়. একটু গরম জল চেয়েছি। কিন্তু কেউ কানেই তোলে না। এর মানে কি? একটা মেয়ে এখানে যায় যায় আর বাড়ির কারুর এতটুকু ইয়াদ নেই। এমন বাড়ি তো জন্মে দেখিনি। এরা কি মানুষ!

তলাপাত্রর কথা মিথ্যে নয়, সত্যিই এ বাড়িতে মানুষ

কোথায়? চাকরগুলো যেমন অবাধ্য তেমনি পাপিষ্ঠ। হবে নাই বা কেন? মনিব যাদের সারাক্ষণ পাপের মধ্যে ডুবে থাকে তারা যে ওই রকম বেয়াড়া হবে তাতে আর বিচিত্র কি।

কিছুক্ষণ পরে তলাপাত্রর একজন সহকারী ওষুধপত্র আর ইনজেকসনের সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হল।

ওষুধ খাওয়ানো এবং ইনজেকসন দেবার পর তলাপাত্র মল্লিকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, শুনছেন, চেয়ে দেখুন, কে এসেছেন।

একটু থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হয়ত আর জ্ঞান ফিরবে না। ভীষণ রক্তক্ষয় হয়েছে, তাছাড়া কানের কাছে কপালের ওপর ঘুসি মারা হয়েছে, তার দরুণ ওই জায়গার শির হয়ত ছিঁড়ে গেছে।

ডাক্তার চুপ করলেন। আমি একদৃষ্টে মল্লিকার মুখের পানে তাকিয়ে রইলাম।

মল্লিকার ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপল। তারপর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। ঘোলাটে দৃষ্টি। কাকে যেন খুঁজছে।

তলাপাত্র তাড়াতাড়ি তার মুখে একটা উত্তেজক ওষুধ ঢেলে দিলেন। ওষুধে বোধ হয় কাজ হল।

তলাপাত্র আমাকে বললেন, নিন, এইবার আপনার যা যা জিজ্ঞাসা করবার, করে নিন। যান, কাছে যান।

আমি তার পাশ ঘেঁসে মাথার কাছে বসলাম। মল্লিকার দৃষ্টি আমার ওপর পড়ল। কী মর্মস্পর্শী সে দৃষ্টি! আজো স্পষ্ট মনে পড়ে।

আমি কোথায়? ক্ষীণকণ্ঠে সে ধীরে ধীরে বললে।

বললাম, ভয় নেই, তুমি কুমার বাহাদুরের বাড়িতে রয়েছো। আচ্ছা, মল্লিকা, তুমি আমায় চেনো ?

কয়েক মুহূর্ত সে আমার পানে চেয়ে রইল, তারপর ক্ষীণতর কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, খুব চিনি।

আমি বিনায়ক বসু, পুলিশের দারোগা। কুমার বাহাদুরের মারফতে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়। মনে আছে ?

মল্লিকা তার বাঁ হাতখানি আমার কোলের ওপর রেখে বললে, মনে নেই আবার! সব মনে আছে। তুমি কখন্ এলে ? আরও কাছে এসে বোসো না!

ডাক্তার তলাপাত্র ফিসফিস করে বলে উঠলেন, ডিলিরিয়ম! তাহলে হোপলেস!

আমি বিনায়ক বসু,—বলতে লাগলাম, পুলিসের দারোগা আমি। তোমার মনে থাকতে পারে আজকের পিকনিক পার্টিতে আমি ছিলাম।

মল্লিকা মাথাটা ঈষৎ নাড়ল।

প্রশ্ন করলাম, এখন কেমন বোধ করছ ?

তলাপাত্র আমার কানে কানে বললেন, যা যা খুব দরকারী কথা তাই জিগেস করুন। এ জ্ঞান বেশীক্ষণ থাকবে না।

বললাম, আপনি দয়া করে একটু চুপ করে থাকুন। আমার কর্তব্য আমি বিলক্ষণ জানি।

তারপর মল্লিকার দিকে ফিরে বললাম, আজকের দুপুরের ঘটনা মনে করে দেখতো। আচ্ছা, আমিই তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমরা কুমার বাহাদুরের নেমন্তন্নে তাঁর বাগানে ত্রিকেলে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। তুমি গিছলে, দুর্লভবাবুরা গিছলেন, আরও অনেকেই গিছলেন। আমিও গিছলাম।

মনে পড়ছে ? আচ্ছা। সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল। কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলে তুমি পুকুর-পাড় দিয়ে বনের দিকে এগিয়ে গেলে। গেলে তো ? আচ্ছা। এইবার সমস্ত শক্তি দিয়ে মনে কর, বনের মধ্যে কে যেন হঠাৎ তোমায় আক্রমণ করলে। আমি জানতে চাই, কে সে ?

মল্লিকা চোখ বুজে আমার কথা শুনছিল আর মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে সায় দিচ্ছিল। এইবার চোখ মেলে স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে তাকালো।

আমাদের কাছে সেই লোকটির নাম তোমায় বলতে হবে। তার দিকে ঝুঁকে বললাম।

মল্লিকা ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়ল। সে বলবে না।

বললাম, তোমায় বলতেই হবে। বলা খুব দরকার। তার নাম আমাদের জানা চাই। তাকে সমুচিত শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করব। তার এই নৃশংস আচরণের জন্যে তাকে কঠিন দণ্ড ভোগ করতে হবে। বল তার নাম—আমি অপেক্ষা করে রইলাম।

মল্লিকা স্তিমিতভাবে অল্প একটু হাসল। কোন কথাই উচ্চারণ করল না।

আবার তাকে প্রশ্ন করলাম। কোন ফল হল না। অপরাধীর নাম সে মুখে আনল না। আচ্ছন্ন হয়ে চোখ বুজে স্থির হয়ে রইল।

ডাক্তার আরও দু'একটা ওষুধ ও ইন্‌জেকসন দিলেন। তারা কোন কাজে লাগল না।

ভোরের আলো দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

॥ এগারো ॥

সকালে একজন সহকারী সঙ্গে দিয়ে তদন্ত সুরু করলাম। বাড়ির চাকর-বাকর-দরওয়ান-বেয়ারা-মালিককে পরীক্ষা করলাম, নানাবিধ প্রশ্ন করলাম। এবং তারপর সারা দিন জোর তদন্ত করে এক দীর্ঘ রিপোর্ট খাড়া করে ফেললাম।

প্রথমে, কি অবস্থায় আমি আহত মল্লিকাকে দেখি তার বিবরণ দিলাম। শেষের দিকে তার জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কিন্তু আমার বারবার প্রশ্ন করা সত্বেও সে তার আততায়ীর নাম আমাদের কাছে প্রকাশ করেনি। তার ভাবভঙ্গী থেকে স্পষ্টই বোঝা গিছল. কে তাকে মেরেছে তা মল্লিকা জানে, ইচ্ছে করেই তার নাম সে বলে নি। সুতরাং আততায়ী যে তার আপনজন, তাতে সংশয় নেই।

তারপর তার পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা লিখলাম। দেহের কোন্‌দিকে এবং কোন্‌ অংশে আঘাত করে হয়েছিল তাও লিপিবদ্ধ করলাম।

তার অঙ্গে যেসব গয়না ছিল তার একটিও খোয়া যায়নি, কানের দুল, হাতের চুড়ি, গলার চেনহার সমস্তই যথাস্থানে ছিল। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, চুরীর উদ্দেশ্যে তাকে জখম করা হয়নি।

কী ভাবে সে আক্রান্ত হয়েছিল এবং কেমন করে তাকে আততায়ী আঘাত করেছিল তার যে ছবি আমি কল্পনা দ্বারা তৈরী করেছিলাম তাও এইভাবে নথিবদ্ধ করলাম : মল্লিকা এক সময়

অন্য সকলের সঙ্গ ছেড়ে একা বাগান ছাড়িয়ে বনের মধ্যে ঢোকে। আপন চিন্তায় মগ্ন অবস্থায় সে খানিকটা এগিয়ে যায়। তারপর হয়ত এক জায়গায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই সময় সেইখানে সে আততায়ীকে দেখতে পায়। সে যখন একটি গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল তখন লোকটা হঠাৎ তার কাছে গিয়ে হাজির হয়। লোকটাকে দেখে মল্লিকার মনে কোন সন্দেহ জাগেনি—তাকে দেখে মল্লিকা যদি ভয় পেতো তাহলে সে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তখুনি চেঁচিয়ে উঠত। লোকটার সঙ্গে নিশ্চয় তার কিছু কথা হয়। তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোকটা হঠাৎ মল্লিকার বাঁ হাতের কব্জিটা সজোরে চেপে ধরে, এত জোরে ধরে যে চুড়িগুলো বেঁকে হাতের ওপর চেপে বসে যায় এবং কালশিরা পড়ে। সেই সময় মল্লিকা বোধ হয় চেঁচিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে কিন্তু খুব সম্ভব তার মুখ চেপে ধরা হয়। পরক্ষণেই লোকটা মল্লিকাকে হেঁচকা টান দিয়ে নিজের দিকে আকর্ষণ ক'রে তার মাথায় ঘুষি মারে। হঠাৎ এইভাবে আঘাত পেয়ে সামলাতে না পেরে মল্লিকা মাটিতে পড়ে যায়। তখন লোকটা তার চাবির রিং থেকে ছুরিখানা খুলে নিয়ে তার বুকের ডানদিকে পাঁজরার ওপর বারবার আঘাত করে।

তদন্ত করে যা জেনেছি তার ওপর ভিত্তি করে এই ছবি আঁকলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ আততায়ী কে?

একটু চিন্তা ক'রে দেখলেই এ প্রশ্নের উত্তর মিলবে।

প্রথমত দেখা যাচ্ছে, চুরী বা অন্য কোন রকম পাশবিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করবার জন্যে এ কাজ করা হয়নি। সুতরাং কোন চোর বদমায়েসের কাজ নয়।

দ্বিতীয়ত, মল্লিকা ইচ্ছে করেই খুনীর নাম আমার কাছে

প্রকাশ করেনি—কোন চোর বদমায়েস হলে সে অন্তত তা বলত এবং তার চেহারার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করত। মনে হয়, অপরাধী মল্লিকার কোন প্রিয়জন যার শাস্তি সে কামনা করে না। এখন, এই প্রিয়জন কে হতে পারে? কুমার বাহাদুর? কিন্তু সে তো সেই সময় ঘর থেকে উঠে একবারও অন্য কোথাও যায় নি। কোন চাকর-বেয়ারা? তারাই বা হঠাৎ এমন কাজ করতে যাবে কেন? সব বিবেচনা করে যার ওপর সন্দেহ বদ্ধমূল হয় সে হচ্ছে সীতানাথ। ঘটনার অব্যবহিত পরেই যে অবস্থায় সকলে সীতানাথকে দেখেছিল তাতে কারুর সন্দেহ ছিল না যে সীতানাথই তার বিশ্বাস-ঘাতিনী দুশ্চরিত্রা স্ত্রীকে রাগের বশে খুন করেছে।

॥ বারো ॥

পরদিন থানায় বসে সীতানাথের জবানবন্দী নিলাম।

সীতানাথ প্রথমে যথারীতি তার পিতৃ-পরিচয় দিলে। তারপর তার চাকরির কথা এবং মল্লিকাকে বিয়ে করবার কথা জানালে। তারপর আর কোন কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রশ্ন করলাম, বিয়ে করবার পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে তোমার বনিবনা হত না—একথা সত্যি?

ঘাড় নেড়ে সীতানাথ জবাব দিলে, হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু হুজুর, দয়া করে ওসব আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। সবই তো জানেন।

না, আমি কিছুই জানি না। এখন আমার প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি কি তোমার স্ত্রীকে নির্যাতন করতে, তোমার স্ত্রীকে তুমি কোন দিন মেরেছিলে? কুমার বাহাদুরের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিকৃত করে দেখে তুমি কি একদিন তোমার স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছিলে? উত্তর দাও।

ধীরে ধীরে সীতানাথ বললে, হাত তুলিনি। একদিন শুধু রাগের বশে তার হাত চেপে ধরেছিলাম। মারিনি কোনদিন। হুজুর, দয়া করে ওসব কথার রেহাই দিন।

তার কথায় কর্ণপাত না করে পরবর্তী প্রশ্ন করলাম, কুমার বাহাদুরের সঙ্গে তোমার স্ত্রীর যে খারাপ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা তুমি জানতে?

ম্লান হেসে সে জবাব দিলে, জানতাম বৈকি।

বললাম, তোমার স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখে নিলাম। এখন বল দিকি, যে জায়গায় তোমার স্ত্রী শত্রুর হাতে জখম হয় সে-জায়গায় ঠিক ওই সময় তুমি হাজির হলে কেমন করে ?

সীতানাথ বললে, বলছি হুজুর। চাকরি যাবার পর পাশের গাঁয়ে এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকতাম। ছেলেটাকে তাদের কাছে রেখে আমি পড়ে থাকতাম একটা তাড়ির দোকানে। পয়সার অভাবে দু'দিন নেশা জোটে নি। সেদিন সকালে মাথাটা পরিস্কার ছিল। অনেক দিন পরে মল্লিকার সঙ্গে দেখা করবার ভারী ইচ্ছে হল। কি জানি সে কেমন আছে ? একবার দেখে আসবো, তাতে আর ক্ষতি কি ? এই মনে করে বেরিয়ে পড়লাম। দুপুরবেলা হুজুরের বাড়ির কাছে এসে পৌঁছলাম। এ গাঁয়ে আসতে হলে ঝিলের পাশ দিয়ে ওই বনের ধার ঘেঁসে আসতে হয় —অন্য পথ নেই। বনের ধার দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম, ভারী করুণ কাতরানি, মেয়েমানুষের গলা। বনের ভিতর থেকে শব্দটা এসেছিল—সেই দিকে ছুটে গেলাম। তারপর ....

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সীতানাথ বলতে লাগল, দূর থেকে দেখতে পেলাম, একটি মেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছটফট করছে। কাছে গিয়ে দেখলাম—মল্লিকা ! তার বুকের কাপড় রক্তে ভেসে যাচ্ছে, মুখ তার যন্ত্রণায় কি রকম হয়ে গেছে, কাতরভাবে সে গোঙাচ্ছে। দেখেই আমি তার পাশে বসে তার মাথাটা কোলে তুলে নিলাম। কোন লোককে আশেপাশে দেখতে পেলাম না। শুধু দূরে যেন কার পায়ের শব্দ পেলাম, কে যেন পালাচ্ছে ...

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, বেশ একটা গল্প বানিয়েছো! কিন্তু আদালত তোমার এসব বানানো কথার একটাও বিশ্বাস করবে না। হঠাৎ তুমি অমনি সেখানে হাজির হলে, আর বলা নেই কওয়া নেই আর-একটা লোক বিনা কারণে তোমার স্ত্রীকে খুন করে পালালো, আর তুমি এসেই তাকে বুকে তুলে নিলে —গল্পটা নিতান্ত মন্দ তৈরী করো নি। কিন্তু কোন ফল হবে না।

সীতানাথ বললে, এসব আপনি কি বলছেন? আপনি কি আমাকে সন্দেহ করেন?

সন্দেহ নয়, যা প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে। তোমার বানানো-কথায় কোন কাজ হবে না। আমার মনে হয়, তুমি যদি আর কথা না বাড়িয়ে দোষ স্বীকার কর, তাহলে আমাদেরও তদন্তের সুবিধে হয়, আর তোমারও খানিকটা মঙ্গল হয়। আজ যাও, কাল আবার তোমার জবানবন্দী নেব। ভেবেচিন্তে উত্তর দিও। যাও।

আমার কথা শুনে সীতানাথ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেপাইকে ইসারা করলাম, নিয়ে যাও।

সীতানাথ আর কোন কথা না বলে ঘাড় হেঁট করে সেপাইএর সঙ্গে চলে গেল।

॥ তেরো ॥

সেইদিনই সদর থেকে একজন সিনিয়র ইনস্‌পেকটার এসে উপস্থিত হল। নাম—প্রলয়েশ রুদ্র। বয়সে আমারই সমান। কিন্তু কথাবার্তায় মনে হতে লাগল যেন আমার ডবল বয়স। ভীষণ চালিয়াৎ ধরনের লোক। ধরাকে যেন সরা জ্ঞান করে।

এসেই প্রথমে দাড়ি কামাতে বসল আর তারই ফাঁকে ফাঁকে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগল। এ কাজটা যেন তার পক্ষে কিছুই নয়, এমনি ভাব।

পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তার কাছে সকল ঘটনার বিবরণ দিলাম। আমার কথা শেষ হতেই প্রশ্ন হল, খবর পাবামাত্র ঘটনাস্থলে গিছলেন তো? রিপোর্টে সেকথা লেখেন নি কেন?

বললাম, না, সেখানে যাবার প্রয়োজন বোধ করি নি।

হুঁ, এতবড় দরকারী কাজটাকেই অপ্রয়োজনীয় মনে করলেন। ঠিক করেন নি। যাক, দেখি, সীতানাথ কি জবানবন্দী দিয়েছে।

কাগজপত্র তার হাতে দিলাম। তাদের ওপর চোখ বুলিয়ে আবার প্রলয়েশ আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করল। যথাসাধ্য উত্তর দিলাম।

তার কথায় আর ব্যবহারে আমার হাড়পিত্তি জ্বলতে লাগল।

সীতানাথকে আবার আমাদের কাছে আনা হল। এবার

প্রলয়েশ তাকে প্রশ্ন করতে লাগল। জেরায় তার কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য পাওয়া গেল না। সে শুধু বারবার বলতে লাগল, আমি খুন করেছি মল্লিকাকে! আমি? এও কি সম্ভব!

প্রলয়েশ তাকে এক প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠল, চুপ করো। আর ন্যাকামো করতে হবে না। তোমার মতো ঢের বদমায়েসকে আমরা সায়েস্তা করেছি। স্বীকার করো আর না করো, তুমিই যে মার্ডারার সে বিষয়ে আমাদের কারুরই সন্দেহ নেই। যাও এখন।

সীতানাথকে হাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

কুমারকে খবর দেওয়া হয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে সে এলো। প্রলয়েশ তাকে খাতির করে বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল।

কুমার বললে, সবই বলব। দাঁড়ান, আগে চুরোটটা শেষ করেনি। কম ধকল গেল মশাই ক'দিন ধরে! উঃ! জান একেবারে হায়রান। এসব হাঙ্গামা কি আমার পোষায়! হ্যাঁ। তারপর, আপনি কতদিন এ জেলায় এসেছেন? দু' বছর? বলতে পারেন, জজসাহেবের স্ত্রীর সেই কেলেঙ্কারীটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল? ও, ওসব খবর রাখেন না বুঝি? ভাল। হ্যাঁ, বলি। দেখুন, সীতানাথই যে মল্লিকাকে খুন করেছে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

এই বলে কুমার আগাগোড়া যা বললে, তা আপনারা আগে থেকেই অবগত আছেন। যে-সব কথা সে আমায় মল্লিকা মারা যাবার রাত্রে বলেছিল তারই পুনরাবৃত্তি করলে। তারপর, প্রলয়েশের প্রশ্নের উত্তরে সবিস্তারে মল্লিকার সঙ্গে নিজের অবৈধ সম্পর্কের কথা বিবৃত করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলে না।

তার কথা থেকে একটি নতুন তথ্য পেলাম যা সে আমার কাছে বলেনি। শুনলাম, গ্রামান্তরে থাকবার সময় সীতানাথ কুমারকে দু'তিনখানা চিঠি লিখেছিল। কোন কোন চিঠিতে সে কুমারকে গালিগালাজ করেছিল এবং শাসিয়েছিল, কোনখানাতে বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে সকাতর অনুরোধ জানিয়েছিল। এই চিঠিগুলি আমাদের কাজের অনেক সহায়তা করবে বলে মনে হল।

পরদিন প্রলয়েশ তার তদন্তের রিপোর্ট আমার হাতে দিয়ে চলে গেল। তার মতে—নিঃসন্দেহে সীতানাথ অপরাধী।

অভিমত পড়ে হাসলাম। কি নতুন কথাই শুনিয়ে গেলে!

॥ চৌদ্দ ॥

দিন তিন চার পরে।

ইতিমধ্যে কুমার তার স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতা চলে গেছে। বলা বাহুল্য, শঙ্কর চৌধুরীও সঙ্গে গেছে।

কাজের সুবিধার জন্যে গতকাল থেকে কুমারের বৈঠকখানায় কাছারি বসিয়েছিলাম। প্রলয়েশ রুদ্রই এই ব্যবস্থার কথা কুমারকে বলে গিছল।

সীতানাথকে নিকটস্থ হাজতে রাখা হয়েছিল। কুমারের বাড়ি থেকে হাজত এক মিনিটের পথ। সুতরাং যখন ইচ্ছে তাকে আমাদের কাছে হাজির করার সুবিধা ছিল। আমার বাসা অনেকটা দূরে। থানার দূরত্ব আরও বেশী। তাই কুমারের বাড়িতে কাছারি করে সকল দিক দিয়েই আমার কাজের সুবিধা হয়েছিল। গতকাল থেকে রাত্রেও সেখানে থাকবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

সকালবেলা কয়েকখানা জরুরী চিঠি লিখছিলাম। প্রথম চিঠিটা শেষ করেছি এমন সময় বাইরে মহা হট্টগোল হচ্ছে শুনতে পেলাম।

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, কুমারের কয়েকজন বেয়ারা-খানসামা ক্লার্তিককে ধ'রে টানাটানি করছে। আমাকে দেখতে পেয়ে সুখন বেয়ারা বলে উঠল, হুজুর, একে আপনার কাছেই নিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখুন না, পাজিটা কিছুতেই যেতে চাইছে না।

বাইরে গিয়ে বললাম, কেন, ওকে আমার কাছে আনতে চাও কেন ?

হুজুর, কার্তিক খুন করেছে।

কার্তিক খুন করেছে! কাকে খুন করেছে ?

সীতানাথ দাদাবাবুর ইস্ত্রীকে! তেনাকে আপনারা শুধু শুধু আটক করেছেন হুজুর। খুন করেছে এই কার্তিক।

সুখনের কথা শুনে কার্তিক বিকটকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল, না হুজুর, মিছে কথা। ভগবান জানেন, হুজুর, আমার কোন অপরাধ নেই।

জানতাম, কুমারের এই পেয়ারের-খানসামার প্রতি অন্য সব চাকর-বেয়ারারা প্রসন্ন ছিল না। কার্তিক প্রকাশ্যেই তাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করত। কিন্তু তাই বলে কী সাহসে তারা এত বড় অভিযোগ করছে ?

কার্তিকের কথায় ভেংচে উঠে সুখন বেয়ারা তাকে রীতিমত জেরা করতে লাগল, অপরাধ নেই ? চালাকি। তবে তোর জামায় রক্তের দাগ লাগল কেমন করে ? কেন বলতে পারছিস না—কেমন করে তোর ফতুয়ায় রক্ত লাগল ? আর লুকিয়ে লুকিয়ে তাকে ধুয়ে ফেলছিলিই বা কেন ? এই গিরিধারী, নিয়ে আয় তো ফতুয়াটা।

বলা মাত্র গিরিধারী একটা আধময়লা শাদা ফতুয়া এনে আমার সামনে মেলে ধরল। দেখলাম, সত্যিই তার স্থানে স্থানে রক্তের দাগ অস্পষ্ট হয়ে লেগে রয়েছে।

তাকে এবং বেয়ারাদের জেরা করে জানতে পারলাম, যে-সময় কুমার আর তার অতিথিরা বনের ভিতর থেকে ভেসে-আসা নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনতে পায় তার কিছুক্ষণ আগে কার্তিক

বনের সেই দিকেই ঢুকেছিল, এবং অনেকক্ষণ কেউ তার দেখা পায়নি। মল্লিকাকে যখন তুলে আনা হয়, তখনো কার্তিককে কেউ দেখেনি।

আমার সামনে দাঁড়িয়ে কার্তিক রীতিমত কাঁপছিল। তার ভীতত্রস্ত মুখের দিকে চেয়ে বললাম, যা জিগেস করব তার যদি ঠিক ঠিক উত্তর দিস তাহলে তোকে ছেড়ে দেব। নইলে কিন্তু গোলমাল হবে। বল্ সত্যি করে, বনের মধ্যে গিয়েছিলি ?

জোড়হাতে কার্তিক বললে, আজ্ঞে হুজুর গিয়েছিলাম। বাবুদের দেবার সময় নিজেও একটু বেশী খেয়ে ফেলেছিলাম, মিথ্যে বলব না হুজুর। তাই মাথাটা কেমন ঘুরছিল। নিরিবিলি এক জায়গায় একটু জিরিয়ে শরীরটাকে ঠিক করে নেব ভেবেই বনের মধ্যে ঢুকেছিলাম। একটুখানি গিয়ে ফাঁকা জমি দেখে শুয়ে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে গেলাম। কে যে খুন করলে, কে যে চীৎকার করলে, এসব কিছুই জানি না। দোহাই হুজুর, আমার একটি কথাও মিথ্যে নয়।

তোর ফতুয়ায় রক্ত লাগল কি করে ?

তা তো জানি না হুজুর।

মানে ? ফতুয়া কি তোর নয় ?

মাথা নেড়ে কার্তিক বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই। কিন্তু কেমন করে যে রক্ত লাগল, তা জানি না। জেগে উঠে দেখতে পেলাম।

ধমক দিয়ে বললাম, বাজে কথা রেখে দে। নিশ্চয় জানিস তুই। যা, ভালো করে ভেবেচিন্তে কাল এসে আমায় বলবি। খবরদার, মিথ্যে কথা বলবার চেষ্টা করিস নি। সুখন, ওকে নজরবন্দী করে রাখ্।

এ আবার এক নতুন ফ্যাকড়া বেরুলো !!

পরদিন সকালে আবার সকলে মিলে কার্তিককে আমার কাছে নিয়ে এলো।

বললাম, কিরে, ভেবে ঠিক করেছিস ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উচ্চকিত হলাম ঃ কেমন ক'রে তোর জামায় রক্ত লাগল ?

মনে পড়ছে হুজুর। কিন্তু সে যেন স্বপ্নের মত, ধোঁয়ার মত। সত্যি কি না জানিনা হুজুর, কিন্তু মনে পড়ছে ....

কি মনে পড়ছে, বল্।

কার্তিক বলতে লাগল, ঝাপসা ঝাপসা মনে হচ্ছে হুজুর। খুব নেশার ঘোরে পড়েছিলাম .... হঠাৎ মনে হল, কে যেন পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে .... চোখ খুললাম .... আধবোজা চোখে দেখলাম, একজন লোক, আমার কাছে এসে দাঁড়াল, তারপর নীচু হয়ে আমার জামার ওপর তার হাত দুটো মুছলো .... মনে হল যেন তাকে চিনি ....

বললাম, বলিস্ কি ? কি রকম দেখতে ?

ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়ত আমার ভুল ....

বললাম, তাকে কি সীতানাথের মতো দেখতে ? ভাল করে মনে করে ছাখ্! ঠিক করে বল্। তোর কোন ভয় নেই।

না, তাঁর মতো নয়, কিম্বা হয়ত হবেও বা।

আবার ধমক দিয়ে উঠলাম, আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, আজ যা। ভাল করে মনে করে দেখ্‌গে যা। কাল এসে বলবি।

এই বলে তাকে সেদিনকার মতো বিদায় করে দিলাম।

আমার এই প্রায়-সমাপ্ত কাজের মধ্যে সহসা কার্তিকের আবির্ভাবে সমস্ত যেন গুলিয়ে গেল। কি করব কিছুই যেন ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না।

কার্তিক তার দোষ অস্বীকার করছে কিন্তু তার জামায় রক্তের দাগ সম্বন্ধে সে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়তও দিতে পারছে না। আমার বিশ্বাস, সে যে অচেনা লোকের কথা বলছে তা সর্বৈব মিথ্যে। এর মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ আছে।

কার্তিক সম্বন্ধে নতুন খবর শুনে প্রলয়েশ এসে উপস্থিত হল। এসেই হাত পা নেড়ে বক্তৃতাঃ দেখলেন তো, তখনই বলেছিলাম, ভুল করেছেন। খবর পেয়েই যদি প্রথমেই ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করতেন তাহলে এ নতুন উৎপত্তি উঠতো না। তখনই যদি সব কটা চাকরবেয়ারাকে সামনে হাজির করতেন তাহলে ওই চাকরটার খোঁজ পড়ত আর হাতে হাতে অনেককিছু তথ্য পাওয়া যেতো।

কার্তিককে ডেকে এনে প্রলয়েশ জেরার ঝড় বইয়ে দিলে। কিন্তু কোন নতুন কথা জানা গেল না।

কতখানি মদ টেনেছিলি ?

আজ্ঞে, তা, তা, আধ বোতল হবে।

প্রলয়েশ বললে, হুঁ, বেটা পাঁড় মাতাল! আচ্ছা, বিনায়ক বাবু, সীতানাথকে আনান তো।

সীতানাথকে এনে হাজির করা হল।

প্রলয়েশ কার্তিককে প্রশ্ন করলে, চেয়ে দেখ এর দিকে। সেই লোকটাকে এবার মনে পড়ছে ?

ভয়ভয় চোখে কার্তিক বললে, আজ্ঞে হুজুর, বোধ হয় . নয়। কিম্বা·হবেও না।

ধমকে, রেগে, চীৎকার করে প্রলয়েশ তাকে নানাভাবে আরও নানা প্রশ্ন করলে, কিন্তু কার্তিক ঠিক করে কিছুই বলতে পারলে না।

বিরক্ত হয়ে প্রলয়েশ চলে গেল। বলে গেল, দু'দিনের মধ্যে আমার ফাইনাল রিপোর্ট যেন তার কাছে পৌঁছোয়।

তদন্ত চলতে লাগল। নতুন যে কী খোঁজ খবর বা তল্লাস করব তা ভেবে পেলাম না। বার দুই ঘটনাস্থলে গিয়ে অনুসন্ধান করলাম, যদি কোন সূত্র পাওয়া যায়। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না।

সীতানাথ আর কার্তিককে একই হাজতে পাশাপাশি দুটো ঘরে আবদ্ধ করে রাখা হল।

সীতানাথ যেন দিন দিন হতাশ হয়ে ভেঙে পড়ছিল। কার্তিক ধরা পড়েছে শুনে সে বললে, ঠিকই হয়েছে। এতদিনে সত্যিকারের খুনীকে পাওয়া গেছে। ও ব্যাটা পাকা সয়তান। ওরই কাজ। এবার তাহলে বোধ হয় আমি ছাড়ান পাবো।

॥ পনেরো ॥

পরের দিন জেলার এসে জানাল, কার্তিক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

তাকে নিয়ে আসতে বললাম।

কার্তিক এসে দাঁড়াল। বললাম, কি বলবার আছে, চট্‌পট্‌ বল্‌। বলেছি তো, সত্যি কথা বললে, যাতে রেহাই পাস তার ব্যবস্থা করব। নইলে জেলে পচে মরতে হবে।

কার্তিকের মুখে কথা নেই। আমার পানে চেয়ে সে যেন কী এক অজানা আতঙ্কে কাঁপতে লাগল।

কি হল রে! চুপ করে রইলি কেন? বলে ফ্যাল্‌।

কাঁপা গলায় আমতা আমতা করে কার্তিক বললে, সে এক ভয়ানক আশ্চর্য কথা হুজুর। সেই লোকটাকে যেন এখন মনে করতে পারছি।

বটে। কে সে? খুব সাবধান, সত্যি কথা বলবি।

কিন্তু বলতে যে বড় ভয় করছে হুজুর। আমার বোধ হয় আমি স্বপ্ন দেখেছি।

রেগে উঠলাম, ফের যা-তা বক্‌ছিস! কি তোর মনে হচ্ছে, শিগগির বল।

কার্তিক কাঁপতে লাগল। একটু থেমে জড়িতকণ্ঠে বললে, *প্রথমে ভেবেছিলাম, বলব। কিন্তু এখন বড্ড ভয় করছে। কাল বলব হুজুর। বড়-পুলিশবাবুর কাছে বলব। আজ ....*

অত্যন্ত রাগ হল। এমনি ক'রে বার বার মূল্যবান সময় নষ্ট করা। তাকে আমার সুমুখ থেকে নিয়ে যেতে আদেশ দিলাম।

সন্ধ্যায় কয়েদখানায় গিয়ে মিছামিছি করে সীতানাথকে বললাম, কার্তিক তাকেই খুনী বলে সনাক্ত করেছে। অতএব তার এখন সব কথা অকপটে স্বীকার করাই ভাল।

শুনে সীতানাথ গুম হয়ে বসে রইল। কোন কথাই বললে না।

দেখলাম, ক'দিন হাজত বাস করে তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। দু' চোখের কোলে ঘন কালি পড়েছে। শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। তার অনুরোধ মঞ্জুর করে গার্ডকে আদেশ দিলাম, সীতানাথ যদি তার ঘরের বাইরে এসে এই বাড়ির মধ্যেই একটু ঘুরে ফিরে বেড়াতে চায়, তাকে সে অধিকার দেওয়া যেতে পারে, তাকে চাবি বন্ধ করে রাখবার দরকার নেই।

সীতানাথের কাছ থেকে কার্তিকের ঘরের সুমুখে এসে দাঁড়ালাম।

ঘরের এক কোনে দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে সে বসেছিল, আমার সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

বললাম, কি রে, ভেবে দেখেছিস ? কিছু বলবার আছে ?

হাত জোড় করে কার্তিক বললে, ইনসপেক্টার-বাবু আসুন, হুজুর। তাঁর কাছে বলব।

বেশ তাই বলিস। বলে চলে এলাম।

পরদিন সকালে হাজতের জমাদার হাঁপতে হাঁপাতে আমার কাছে এসে উপস্থিত হল।

কী ব্যাপার ?

ভীষণ ব্যাপার সার ! কার্তিক খুন হয়েছে !

সে কি !

আজ্ঞে হ্যাঁ ! সকালে তার সাড়াশব্দ না পেয়ে ঘর খুলে দেখি ঘরের মেঝেয় সে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলাম মারা গেছে। কে যেন গলা টিপে তাকে পিষে মেরেছে। রোগা মানুষ, বেশীক্ষণ যুঝতে পারেনি।

আমাদের এই মামলায় সাক্ষী হিসেবে কার্তিক খুব মুল্যবান ছিল। এমনি করে কে তাকে খুন করলে ?

হত্যাকারীর খোঁজে বেশীদূর যেতে হল না। সে হাতের কাছেই ছিল। তাকে ডেকে আনিয়ে বললাম, স্ত্রীকে মেরেই ক্ষান্ত হলে না, শুধু শুধু একজন নিরপরাধ চাকরকেও এমনি করে খুন করলে ! কী তার অপরাধ ? না, সে তোমায় দোষী বলে সনাক্ত করেছিল !

আমার কথা শুনে সীতানাথ আড়ষ্ট কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে কোন কথা নেই।

বললাম, কাল তোমাকে হাজতের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াবার অনুমতি দিয়েছিলাম। এমনি করেই তুমি সেই অনুমতি পালন করলে !

সীতানাথ স্খলিতস্বরে শুধু বললে, এসব আপনি কি বলছেন !

উত্তপ্ত হয়ে উঠলাম ঃ ঠিকই বলছি। প্রমাণ চাও ? এখনি প্রমাণ দিচ্ছি। আমার হুকুমে তোমার ঘরের দরজা খোলা রাখা হয়েছিল। বোকা ওয়ার্ডার দরজার চাবিটা তাতে লাগিয়েই রেখেছিল। পাশাপাশি ঘরের দরজাগুলোও ওই একই চাবি

দিয়ে খোলা যায়। সেই চাবি দিয়ে গভীর রাত্রে তুমি কার্তিকের ঘরের দরজা খুলে তাকে গলা টিপে মেরে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলে। তোমায় সে দোষী বলেছিল বলে তুমি এমনি করে তার প্রতিশোধ নিলে। জানো, তোমার এই কাজের জন্যে হাজতের জমাদার আর গার্ডের চাকরি তো যাবেই, আমার চাকরিতে পর্যন্ত টান পড়তে পারে।

আমার কথা শুনতে শুনতে সীতানাথের ঘাড় ঝুলে পড়েছিল। আমার কথা শেষ হবার পর সে তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথা বললে না।

তাকে যেন আর চোখের সামনে সহ্য করতে পারছিলাম না। হাত নেড়ে গার্ডকে বললাম, নিয়ে যাও। আমার কথা শেষ হয়ে গেছে।

তারপর সীতানাথের সঙ্গে আর আমার কোন কথাবার্তা হয়নি।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, এমন সময় এমন এক ঘটনা ঘটল যাতে আমার দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটা পালটে গেল। যে জীবন-নাট্যের একজন প্রধান অভিনেতা ছিলাম এতদিন, হঠাৎ মঞ্চ থেকে নেমে যেন সেই নাটকের একজন দর্শকের আসনে গিয়ে বসলাম।

কথাটা খুলে বলি।

ইনসপেকটার প্রলয়েশ আমার কাজকর্মে অসন্তুষ্ট হয়ে আমার নামে রিপোর্ট করেছিল। ঠিক তার পরেই কার্তিক খুন হওয়ায় কর্তারা আমার ওপর আগুন হয়ে উঠলেন এবং হাজত-জমাদার ও গার্ডের কাজের গাফিলতির জন্যে আমাকে

দায়ী করলেন। তাদের চাকরি গেল। আমার ওপর মিষ্ট ভাষায় হুকুম হল ঃ এখনি পদত্যাগ-পত্র দাখিল করুন।

এমন যে ঘটবে আগে থেকেই তা অনুমান করেছিলাম এবং সেজন্যে তৈরী হয়েই ছিলাম। হুকুম পাবার সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলাম।

॥ ষোলো ॥

কিছুদিন পরে এক সমন পেলাম।

সীতানাথের মামলায় আমাকে সাক্ষী দিতে হবে। ছিলাম যার তদন্তকারী দারোগা, একদিন সেই মামলার সাক্ষীরূপে কাঠ গড়ায় উঠে দাঁড়ালাম।

সেদিন আমার আগে শঙ্কর চৌধুরী সাক্ষী দিচ্ছিল। সে মল্লিকার সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে আমাদের অবৈধ সম্বন্ধের প্রতি ইঙ্গিত করল।

সীতানাথ আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শুনছিল। শঙ্কর চৌধুরীর কথা শুনে বলে উঠল, না, ধর্মাবতার, ওঁর কথা মিথ্যে। আমি আমার স্ত্রীকে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এঁকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

তারপর আমার পালা এলো। সরকার পক্ষের উকিল প্রথমেই আমাকে সেই প্রশ্ন করলেন। অর্থাৎ আমার সঙ্গে নিহত স্ত্রীলোকটির কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল কিনা।

একবার মনে হল, সব কথা খুলে বলি। পরক্ষণেই ভাবলাম, তা বললে সীতানাথ মনে বড় আঘাত পাবে আর তাছাড়া কী বা লাভ হবে এখন বলে ?

উত্তরে বললাম, না, আমার সঙ্গে মৃতা মল্লিকার কোন দুষ্য সম্পর্ক ছিল না।

অতঃপর সরকারী উকিল তাঁর সওয়ালে জ্বলন্ত ভাষায় তাঁর

বক্তব্য ও ঘটনা বিবৃত করলেন। প্রথমে মল্লিকার কথা। তারপর কার্তিকের কথা। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সীতানাথকে খুনী বলে অভিযুক্ত করলেন।

সীতানাথের আত্মীয়রা তাকে বাঁচাবার জন্যে উকীল দিয়েছিল। তিনিও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন।

কিন্তু কোন ফল হল না। অধিকাংশ জুরীর মতে সীতানাথ দোষী সাব্যস্ত হল এবং সেই রায় অনুসারে বিচারক তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন।

সীতানাথের আত্মীয়রা আপীল করলে। কিন্তু আপীলের শুনানী হবার আগেই সীতানাথ মানুষের বিচার এড়িয়ে চলে গেল। রায় বেরুবার দু'দিন পরে জেল হাজতের মধ্যেই সে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল। বেঁচে গেল সীতানাথ। ফাঁসীর দড়িতে দম আটকে মরার চেয়ে এ মৃত্যু অনেক ভাল।

॥ সতেরো ॥

তারপর সুদীর্ঘ আট বছর কেটে গেছে।

এই আট বছরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। দুর্লভবাবু মারা গেছেন। শুনেছি বাসুদেবের সঙ্গে সবিতার শেষ পর্যন্ত মিলন হয়েছে। ভালই হয়েছে।

কুমার তার সম্পত্তির অধিকাংশই মদে এবং জুয়ায় নষ্ট ক'রে এখন স্ত্রীর কাছ থেকে মাসোহারা নিয়ে দিনযাপন করছে। তার অবশিষ্ট সম্পত্তি এখন বিমলা দেবী আর শঙ্কর চৌধুরীর কবলে।

ভবানীপুরে একটি ছোট ফ্ল্যাট নিয়ে কুমার একা বাস করে। স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। সামান্য হাত খরচ যা পায় তাতে তার চলে না। প্রায়ই ধারকর্জ করে।

চাকরি খুইয়ে আমি থাকি শ্যামবাজারে এক মেসে। বাবা-মা দু'জনেই কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। সদাশিব দেশে চলে গেছে। ভাই-বোন কেউ ছিল না। সংসারে কোন বন্ধনই সুতরাং নেই। হাতে কিছু টাকা আছে। কিছু কোম্পানীর কাগজ। তাই দিয়ে কোন মতে চালাই।

কুমার মাঝে মাঝে আমার মেসে আসে। তার মনের সে প্রফুল্লতা গিয়েছে। মুখের ওপর নিবিড় অবসাদের ছাপ। তবুও মাঝে মাঝে আমার ঘরে বসে নিবিষ্ট চিত্তে একটি দামী চুরোট খেতে খেতে বলে, ওহে, চল না, আজ একটু বেড়িয়ে আসা

যাক। অনেকদিন কোথাও যাই নি। সঙ্গে আছে গোটা পঞ্চাশেক টাকা। যাবে?

ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলি, টাকাটা রেখে দাও। আজ খরচ করে ফেললে, কাল তো আবার ধার করতে বেরুবে।

কুমারও মৃদু ম্লান হাসে। বলে, তা সত্যি। তাছাড়া, তুমি যে যাবে না, তাও জানি। আচ্ছা ভাই, আজ চলি।

ধীরে ধীরে সে চলে যায়।

আমি ঘরের মধ্যে একা বসে পিছন ফিরে তাকাই। সমস্ত অতীতটা যেন আমার কাছে গতকালের মতো স্পষ্ট মনে হয়। তার প্রত্যেকটি ঘটনা দিনরাত্রির সর্ব সময় আমার চোখের সামনে ভাসছে …

মাঝে মাঝেই মল্লিকাকে মনে পড়ে। সেই মল্লিকা! মন্দির-পথে তার সঙ্গে সেই সাক্ষাৎটি আমি ভুলতে পারি না। তেমনি করে আজ যদি আর-একবার তার সঙ্গে পথ চলতে পারতাম ….

সীতানাথ। বেচারী সীতানাথ। তার কথা ভাবলেই তার প্রতি আমার মন সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। কল্পনায় তার সেই রক্তমাখা হাত দু'খানা ধরে আমি তাকে সমবেদনা জানাই, তার কাছে ক্ষমা চাই ….

গভীর রাত্রের অন্ধকারে স্মৃতির প্রদীপ জ্বেলে আমি যেন মল্লিকা সীতানাথ আর কার্তিকের ছায়ামূর্তি দেখতে পাই। তন্দ্রাহীন নিশীথে তারা যেন আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ায়। আমি ভয় পাই না, চীৎকার করি না, শুধু অসহায়ের মত করুণ চোখে তাদের পানে চেয়ে থাকি।

॥ শেষের পর ॥

গল্প শেষ হল। এইবার আমি, অর্থাৎ 'নবকেতন' পত্রিকার সম্পাদক, পাঠকের সঙ্গে আমার কথা শেষ করব। "আরম্ভের আগে" বলেছি, বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে, সুশান্ত মিত্রের উপন্যাসটি আমার পত্রিকায় ছাপা হয়নি। তার কারণ এই যে, পরের মাস থেকেই আমার কাগজটি নানা বিভ্রাটে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু লেখাটি এতদিন আমার কাছেই পড়েছিল। আজ বহুদিন পরে (বোধ হয় বিশ বছর হবে) সেই কাহিনী পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করলাম।

মনে পড়ছে, তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের তিন চার মাস পরে সুশান্ত মিত্র আমার বাড়ির ঠিকানা খুঁজে বার ক'রে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

ঘরে ঢুকেই ঠিক তেমনি বিব্রতভাবে বললেন, বলেছিলেন মাস তিনেক পরে আসতে। তাই এলাম। আমাকে মনে আছে তো?

বললাম, তা আছে বৈকি। বসুন।

আসন গ্রহণ করে তিনি বললেন, আপনাকে হয়ত বিরক্ত করলাম। ক্ষমা করবেন। মনে আছে বোধ হয়, একটি উপন্যাসের ম্যানাস্‌ক্রিপট আপনাকে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলছিলাম কি, গল্পটি কি পড়েছেন?

বললাম, হ্যাঁ পড়েছি।

বিচারে কি আদেশ হল ?

বিচারে দোষী বলেই সাব্যস্ত করলাম। তবে বোধ হয় পুনর্বিচার করে দেখা যেতে পারে।

আমার কথা তিনি হয়ত ঠিক মতো বুঝতে পারলেন না। বললেন, তাহলে ছেঁড়াকাগজের-ঝুড়িতে তাকে ফেলে দেওয়াই কি স্থির করলেন ?

বললাম, না, তার দরকার হবে না বোধ হয়, একটা সংশোধক ব্যবস্থা দিলেই হবে। আপনার পাণ্ডুলিপিতে আমি জায়গায় জায়গায় কিছু মন্তব্য করেছি। সেগুলি দিয়েই শুধরে নেওয়া যাবে।

সুশান্ত মিত্র বললেন, ওর মধ্যে শুধরে নেবার কি আছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

বলব। কিন্তু তার আগে পরস্পরের মধ্যে কয়েকটা কথা খোলাখুলি হওয়া চাই।

বলুন।

কয়েক মিনিট চুপ করে রইলাম। মনের মধ্যে যে অস্বস্তি বোধ করছিলাম, মুখে তা প্রকাশ পেতে দিলাম না। বললাম, আপনার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময় আপনি বলেছিলেন আপনার উপন্যাসের ঘটনাগুলি বাস্তবজীবন থেকে নেওয়া, সব ঘটনাই সত্যিকার ঘটেছিল। আপনার এই কথা স্বীকার করছেন তো ?

মাথা নেড়ে তিনি বললেন, নিশ্চয়। সমস্ত ঘটনাই সত্যি। আমিই হচ্ছি উপন্যাসের বিনায়ক।

অতএব আপনিই প্রথম মল্লিকার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন ?

সুশান্ত মিত্র হাসলেন, তাঁর মুখ যেন ঈষৎ রাঙা হয়ে উঠল।

বললেন, হ্যাঁ, তার জন্যে হয়ত আমার শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কে কার শাস্তি দেয় তার ঠিক নেই। অতএব ....

বললাম, তা বটে। কে কার শাস্তি দেয়! অতএব আপনাকে কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করল না।

সুশান্ত মিত্র মুখ নীচু করে পিরানের বোতাম ঠিক করতে লাগলেন।

একটু থেমে বললাম, গল্পের মধ্যে কিছু অদল-বদল করতে চাই—অবিশ্যি আপনার অনুমতি নিয়েই তা করব।

বলুন কি করতে চান?

তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে বললাম, মূল ঘটনার মধ্যেই কিছু পরিবর্তন করতে চাই। এর মধ্যে সবই আছে কিন্তু প্রকৃত যে দোষী কেবল সে-ই নেই। তাকেই আমি সবার সামনে উপস্থিত করতে চাই।

সুশান্ত মিত্র বড় বড় চোখে আমার পানে তাকালেন। বললেন, কী বলছেন আপনি! আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না।

বললাম, সীতানাথ কারুকে খুন করেনি।

সে কি!

হ্যাঁ। সীতানাথ আসল অপরাধী নয়।

মাথা নেড়ে তিনি বললেন, হতে পারে। হয়ত জজ এবং জুরীরা ভুল করেছিল।

শুধু তারাই নয়। আপনিও ভুল করেছিলেন।

ভুল করেছিলাম? ও, আপনি বোধ হয় বলতে চাইচেন, আমার তদন্তে ভুল ছিল।

হ্যাঁ, ভুল ছিল। এবং আপনি ইচ্ছে করেই ভুল করেছিলেন।

সুশান্ত মিত্র বললেন, ক্ষমা করবেন। আপনার কথা বুঝলাম না। আপনার মতে তাহলে আসল অপরাধী কে ?

সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আপনি।

আমার কথা শুনে তিনি এমন ভাবে আমার পানে তাকালেন তেমন দৃষ্টি আমি আর কখনো কারো চোখে দেখি নি। প্রথমে সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠল বিস্ময়, তারপর ভয়, তারপর আমার প্রতি সকল মানুষের প্রতি এবং সারা জগতের প্রতি সকৌতুক অবজ্ঞা।

বললাম, মল্লিকা এবং কার্তিক, দুজনকেই আপনি খুন করেছেন।

সুশান্ত মিত্রের দৃষ্টি দেওয়ালের প্রতি নিবদ্ধ। মুখে মৃদু হাসি। ক্ষণেক নীরব থেকে বললেন, আপনি যে আবিষ্কার করেছেন তার জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু আপনার গলা কাঁপছে কেন ? আপনার মুখ যে সাদা হয়ে গেছে ! কী নার্ভাস লোক আপনি !

সুশান্ত মিত্র হেসে উঠলেন। অদ্ভুত ধরনের হাসি। বলতে লাগলেন, কেমন করে এ ধারণা আপনার মাথায় এলো তা জানতে ভারী ইচ্ছে করছে। আমি কি লেখার মধ্যে তেমন কোন স্পষ্ট আভাস দিয়েছি ? মনে তো হয় না। দয়া করে বলুন।

বললাম, আপনি মার্ডারার। এবং এই সত্যিটা আপনি অন্তত আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে পারেন নি।

বটে ! বলুন শুনি ! অত্যন্ত আগ্রহ বোধ করছি।

আগ্রহ বোধ করেন তো শুনুন।

উত্তেজিতভাবে টেবিল ছেড়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী

করতে করতে বললাম. কিন্তু তার আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বলুন।

প্রথমে আমায় বলুন পিকনিক পার্টি থেকে আপনি হঠাৎ কোথায় চলে গেলেন?

গল্পে তো সেকথা লেখা আছে। আমি বাড়ি গেলাম।

কিন্তু কোন্ পথ দিয়ে গেলেন সেকথা কেটে দিয়েছেন। আপনি কি বনের মধ্যে দিয়ে যান নি?

হ্যাঁ, তাই গিছলাম। ঘাড় নেড়ে সুশান্ত মিত্র বললেন।

বললাম, সুতরাং বনের মধ্যে আপনার সঙ্গে মল্লিকার দেখা হওয়া সম্ভব ছিল।

তা ছিল।

বললাম, এবং তার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল।

ঘাড় নেড়ে তিনি বললেন, না, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

পরক্ষণেই হেসে বললেন, কি করে সাক্ষীকে ক্রস্ করতে হয়, তা আপনি মোটেই জানেন না।

বললাম, তা না জানতে পারি। কিন্তু এটা ঠিকই জেনেছি যে সীতানাথের চেয়ে আপনারই সঙ্গে মল্লিকার দেখা হওয়া বেশী সম্ভব ছিল। কারণ, সীতানাথ জানতো না মল্লিকাকে সে-সময় ওইখানে পাওয়া যাবে। আপনি কিন্তু খুব ভাল করেই জানতেন এবং তার সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই সেদিকে গিছলেন।

একটু থেমে বললাম, তারপর বাসায় ফিরে আপনি যে অমন ভীত ত্রস্ত বোধ করেছিলেন তার কারণ কী?

আপনিই বলুন।

বলতে লাগলাম, পাগলের চীৎকার তো রোজই শোনেন। কিন্তু সে-রাত্রে সেই চীৎকার শুনে অতখানি শিউরে উঠেছিলেন কেন? নিজের কাজ স্মরণ করেই আপনি অতখানি ভয় পাচ্ছিলেন, নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন। তারপর যখন সে-রাত্রে আপনি কুমারের বাড়ি গেলেন, তখন সেখানে গিয়ে তৎক্ষণাৎ তদন্ত আরম্ভ করে না দিয়ে আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করতে লাগলেন। কোন পুলিশ কর্মচারীই অতবড় একটা জটিল ব্যাপারে আপনার মতো অমন অবহেলার সঙ্গে কাজ করত না। আপনি জানতেন, কে মল্লিকাকে জখম করেছে। তাই আপনি গা ঘামাচ্ছিলেন না। তাই আপনার অমনতরো গয়ংগচ্ছ ভাব এবং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাবার আয়োজন।

থামলাম। সুশান্ত মিত্র এক দৃষ্টে আমার পানে তাকিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। বললেন, বলুন, থামলেন কেন।

বলতে লাগলাম, তারপর মল্লিকা কিছুতেই খুনীর নাম প্রকাশ করল না—কারণ সে ছিল মল্লিকার প্রিয়। সীতানাথ অপরাধী হলে নিশ্চয় তার নাম মল্লিকা বলে দিত, কারণ সীতানাথের ওপর তার কোন মায়ামমতা ছিল না, তুচ্ছ কারণে সে কুমারের কাছে সীতানাথের নামে লাগিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সুতরাং সত্যি সত্যিই সীতানাথ যদি তাকে জখম করত তাহলে কখনোই মল্লিকা তার নাম গোপন করত না। মল্লিকা আপনাকে ভালবাসতো, তাই জেনেশুনেও সে আপনার নাম প্রকাশ করেনি।

সুশান্ত মিত্র আবার হাসলেন। বললেন, তারপর?

তারপর আপনার তদন্ত? সে তো এক অক্ষম এবং অসার্থক অভিনয়। ঠিক মতো কিছুই তদন্ত করলেন না, ফলে প্রলয়েশের রিপোর্টে আপনার চাকরি গেল। তদন্তের সুরুতেই ঘটনাস্থলে

যারা যারা ছিল তাদের আপনার পরীক্ষা করা উচিৎ ছিল, কিন্তু তা আপনি করলেন না। তার কারণ, তা করতে গেলে, ঘটনার ঠিক আগেই আপনি যে বনের মধ্যে ঢুকেছিলেন তা প্রকাশ হয়ে পড়ত।

বলুন, বলুন।

যা বললাম এই কি যথেষ্ট নয়? তারপর কার্তিকের কথা। প্রথমটা তার মনে পড়ে নি, কিন্তু শেষকালে সে ঠিক মনে করতে পেরেছিল যে আপনিই তার ফতুয়ায় আপনার রক্তমাখা হাত মুচেছিলেন। সেই কথাই শেষের দিন বলতে গিয়ে সে ভয় পাচ্ছিল, ইতস্তত করছিল, আপনি বুঝতে পেরে তাকে স্বমুখ থেকে সরিয়ে দিলেন। অন্য কোন দারোগাই হাতের কাছে অতবড় একটা খবরের সন্ধান পেয়ে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে না নিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিত না। তারপর যখন কার্তিক খুনীকে চিনতে পারলো, ঠিক সেই সময় সীতানাথকে আপনি ঘরের বাইরে বেড়াবার অধিকার দিলেন—তার আগে নয়। আপনি চেয়েছিলেন, সেদিন রাত্রে সীতানাথের ঘরের দরজা খোলা থাক, উদ্দেশ্য, আপনি কার্তিককে খুন করলেও সে-দোষটা যাতে সহজেই সীতানাথের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। আপনি স্থির জানতেন, ইনসপেকটারের কাছে কার্তিক আপনার নাম করত। তাই তাকে ওই ভাবে মেরে সীতানাথের কাঁধে বেমালুম দোষটা চাপিয়ে দিলেন।

সুশান্ত মিত্র বললেন, যথেষ্ট বলেছেন, আর না। যে রকম উত্তেজিত হয়েছেন, হয়ত এখনি ফেণ্ট্ হয়ে পড়বেন। স্থির হয়ে

বসুন। হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন। ওদের দু'জনকেই খুন করেছি আমি।

দু'জনেই নীরব।

আমার সামনে বসে আছে এমন এক ব্যক্তি যে নিজের হাতে দু'দুটো খুন করেছে। মনের মধ্যে যেন তোলপাড় করছিল।

কিছুক্ষণ পরে সুশান্ত মিত্র বললেন, আপনি আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধির জোরে ধরতে পেরেছেন, আর কেউ বোধ হয় পারতো না।

কথা বললাম না।

একটু থেমে তিনি বলতে লাগলেন, তারপর আট বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘ আট বছর ধরে এই ভয়ঙ্কর গোপন কথাটা নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রেখেছি। কিন্তু আর পারছি না। মনে হচ্ছে, এ কথা জগতের লোককে সবিস্তারে না জানালে যেন আমার দম বন্ধ হয়ে যাবে। লোকে জানুক যে আমি একজন সাধারণ মানুষ নই, আমার কাছ থেকে তারা জীবনের একটা ভীষণ সত্যি ঘটনা জেনে নিক। সেই উদ্দেশ্যেই এই কাহিনী লিখেছি। ছত্রে ছত্রে আমি ইঙ্গিত সাজিয়ে রেখে গেছি, তবুও যদি পাঠকরা গল্পটি পড়বার সময় প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান না পায়, সে তাদের বুদ্ধির কম্‌তি। কিন্তু এইবার আমি উঠবো।

বললাম, আর একটু বসুন। লেখক হলেন কেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু কখন্ কেমন করে এবং কেন যে খুন করলেন তা তো বুঝলাম না।

সুশান্ত মিত্র জবাব দিলেন, কখন করলাম এবং কেমন করে করলাম তা তো রিপোর্টের মধ্যেই সাজিয়ে দিয়েছি। কল্পনায় আমি যে রিপোর্ট খাড়া করে পেশ করেছিলাম তা মোটেই কল্পনা নয়—ঠিক ঠিক যা ঘটেছিল তাই লিখেছিলাম। কেন করলাম ? বাস্তবিক, কেন করলাম ? না করলেও পারতাম। খুন করলাম রাগের বশে। প্রচণ্ড ক্রোধে আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছিল। মল্লিকার প্রতি হিংসায় রাগে বিদ্বেষে আমার মাথার ঠিক ছিল না। আইনের ভাষায় যাকে বলে, ফিট্ অফ টেম্‌পোরারি ইনস্যানিটি—আমার তাই হয়েছিল। যেন পাগল হয়ে গিছলাম। ইচ্ছে ছিল, বনের মধ্যে ঢুকে তার কাছে গিয়ে তাকে আরও কিছু কড়া কথা শুনিয়ে দেব। শেষ অবধি দেখলাম, তার নিজেরই অস্ত্র তার বুকে বসিয়ে দিয়েছি। একবার বসিয়ে আশ মেটে নি, বার বার বসিয়েছি ···· ···· আপনি অমন মুখ বিকৃত করছেন কেন ? আমার প্রতি খুব ঘৃণা লাগছে বুঝি ?

বললাম, হ্যাঁ, আপনাকে যেন চোখের সামনে সইতে পারছি না।

বললেন, এ তো স্বাভাবিক। সময় সময় আমি নিজেই নিজেকে সহ্য করতে পারি না। যাক, কথাটা শেষ করি। কার্তিককে কেন মারলাম তা বোধ হয় বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। সে তো আপনি নিজেই বলেছেন এবং যথার্থই বলেছেন, নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই তাকে মারতে হয়েছিল। আচ্ছা, এবার তাহলে চলি। আর বোধ হয় দেখা হবে না।

বললাম, আপনার খাতাখানা ····

সুশান্ত মিত্র বললেন, আপনার কাছেই থাক। ছাপান ভালই। না ছাপান, তাতেও দুঃখ নেই। ওর প্রতি আমার মোহ কেটে গেছে। সাহিত্যিক হবার বাসনাও আর নেই। অতএব খাতাখানাকে আপনার ইচ্ছেমত ব্যবহার করবার সম্পূর্ণ অধিকার আপনাকে দিয়ে গেলাম। চললাম। নমস্কার।

বাংলা কথা-সাহিত্যে আজ যেমন নানা নতুনতর বিষয় ও সমস্যা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তেমনি পুরানো ঐতিহ্যের প্রতিও পাঠক-পাঠিকা আজ ঔৎসুক্য বোধ করছেন, পূর্বসূরিদের সাহিত্যকৃতির পরিচয় জানবার জন্যে আজ তাঁদের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। তাই লক্ষ্য করছি আজকাল একাধিক প্রকাশক বিগতযুগের অনেক লেখকের অধুনা-অপ্রাপ্য সাহিত্য-কর্মকে পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হয়েছেন। আমরাও আমাদের এই নতুন প্রচেষ্টায়, কয়েকখানি সুনির্বাচিত গ্রন্থের মধ্যে, বিগতযুগের এক স্বনামধন্য লেখকের একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাসের পুনঃপ্রকাশের আয়োজন করেছি। উপন্যাসটির নাম **বিয়ের ফুল**। লেখক : **চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়**। আজ থেকে অর্ধশতাব্দী পূর্বে চারুচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার সুরু। বহু উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধগ্রন্থ ও শিশুপাঠ্য বই তিনি রচনা করেছেন। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রারম্ভকালে ঔপন্যাসিক হিসাবেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন এবং শুধু তাই নয়, সেই সময় তিনি একজন বাস্তববাদী ও 'বিপ্লবী' লেখকরূপে চিহ্নিত হয়েছিলেন। তাঁর অনেক উপন্যাসের বিষয়বস্তু ও বক্তব্য নিয়ে তখনকার দিনে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। ১৯৩৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর 'যুগান্তরের' সম্পাদকীয় নিবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—"রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া যে নবীন কবি ও সাহিত্যিকদল বাংলাদেশে আবির্ভূত হন চারুচন্দ্র ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। আজিকার বাংলা সাহিত্যে যে নবীন কথাসাহিত্যিকগণ দেখা দিয়াছেন,

তাঁহাদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা কথাসাহিত্যের এই আধুনিক পরিণতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন চারুচন্দ্রের নাম তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত হইবার যোগ্য। যে বাস্তবতা ও স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধগত বিশ্লেষণমুখিতা এখনকার কথাসাহিত্যে অপরিহার্য বলিয়া স্বীকৃত তাহার পূর্বাভাস চারুচন্দ্রের গল্প-উপন্যাসে পাওয়া যায়। চারুচন্দ্রের পুস্তকগুলি আধুনিক যুগধারাকে আগাইয়া আনার সহায়করূপে অবশ্যই স্মরণীয় থাকিবে।" ১৯২০ সালের ৮ই জুলাই তারিখের Times Literary Supplement পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল—Even if we grant that Rabindra Nath Tagore is the most original and versatile of Bengali writers, there are others, who, if they had written in English, French or German would probably have had a world-wide reputation. Such for instance are such daring and original novelists as Charu Chandra Banerji, Sarat Chandra Chatterjee and Probhat Kumar Mookerji.

সম্প্রতি একাধিক সাহিত্যিক সুধী ও মনীষী চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির পুনর্মুদ্রণ বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁদের সেই অভিমতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা 'বিয়ের ফুল' প্রকাশ করলাম। উপন্যাসটির বিষয়বস্তু যেমন মধুর ও মনোগ্রাহী, তেমনি শাশ্বত সাহিত্যরসে সমৃদ্ধ। ১৩২৭ সালে প্রথম প্রকাশিত 'বিয়ের ফুল' উপন্যাসটির সাহিত্য-সৌরভ আজও পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবে বলেই বিশ্বাস করি।

আমাদের প্রকাশন-তালিকার আর-একটি উপন্যাস **স্বপ্নযমুনা**। **লেখক : ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য**। প্রবীণ লেখক পশুপতি

ভট্টাচার্যের একাধিক উপন্যাস একসময় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 'স্বপ্নযমুনা' গত বছর বসুধারা পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। রচনাটির আলোচনা প্রসঙ্গে 'কথাসাহিত্য' পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন—"সমগ্র কাহিনীটিকে বেষ্টন করে রয়েছে আরণ্য-প্রকৃতির উদার সৌন্দর্য ও মহিমা। এই আরণ্য বর্ণনাতেই লেখক শ্রেষ্ঠ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন—পড়তে পড়তে অনেক সময় বিভূতিভূষণের কথা মনে হয়। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও লেখক বিভূতিভূষণপন্থী, তাঁর শিল্পপন্থা সহজ এবং সরল, কিন্তু সহৃদয় পাঠকের পক্ষে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে স্রোতের জল এখানে স্বচ্ছ হলেও অগভীর নয়। কাহিনীর তিনটি প্রধান চরিত্রই স্পষ্ট এবং জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের কথা এই যে, গল্পের যিনি কথক—অর্থাৎ "আমি"—যিনি বৃন্দাবনের কাহিনীটি চুপ করে শোনা ছাড়া তার মধ্যে আর কোন অংশ গ্রহণ করেন নি—তাঁর চরিত্রটিই যেন সবচেয়ে প্রাণবাণ হয়ে ফুটে উঠেছে আমাদের মনশ্চক্ষুর সামনে। এ অতি দুর্লভ ক্ষমতা। পরিবেশ রচনা ও চরিত্রসৃষ্টি দুই ক্ষেত্রেই লেখক অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কাহিনীর অন্তর্নিহিত মানবিক আবেদনটুকুকে তিনি নূতন রূপ দিয়ে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন।—উপন্যাসের উপসংহারটি অতি সুন্দর ও মর্মস্পর্শী হয়েছে—একবার পড়ে তৃপ্তি হয় না।"

আশা করি 'স্বপ্নযমুনা' উপন্যাসটি আমাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ও পাঠক-পাঠিকাদের চিত্তবিনোদনে সক্ষম হবে।